ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
গোলাম মোস্তাকীম
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী হাসান ইমাম
বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

মোঃ শফিকুল হক

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ মোঃ শফিকুল হক

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৭

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৫ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮-পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেল	ঃ	bpatc@bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭, ৯৩৩৬০৩৮

LOKAPRASASANA SAMAYIKI

Vol. 17, December 2000, Poush 1407

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre
Editor : Md. Shafiqul Haque

© Bangladesh Public Administration Training Center 1407

Telephone	:	7710010-15 (PABX)
Telex	:	62228 PATC BJ
Fax	:	7710029
E-Mail	:	bpatc @ bangla. net
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

সূচিপত্র

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা ঃ
একটি বিশ্লেষণ ১
আবেদা সুলতানা

ঊনবিংশ শতকের প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি ২৫
ড. এম এ মোমেন

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ ঃ একটি পর্যালোচনা ৩৩
মেহেদী মাসুদ

বাজার অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র ও বাংলাদেশ ৬১
মোঃ হাসিবুর রহমান

মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ ঃ প্রশাসন ও সামন্ত প্রভুদের ভূমিকা ৬৯
মোঃ শরীফ হাছান

বাংলাদেশ পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের একটি
তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৮৯
এস, এম, জুবায়ের এনামুল করিম

ইসলামে নেতৃত্ব প্রক্রিয়া ১১৫
মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন

ঢাকা ইপিজেড সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ঃ একটি সমীক্ষা ১৩১
খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব

বাংলাদেশের বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যা ঃ
রাজবাড়ী জেলার পাংশ উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা ১৪৭
মোঃ আসাদুজ্জামান
নাসরীন জাহান জিনিয়া

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ

আবেদা সুলতানা *

The role of tarining in the empowerment of women in Union Parishad : An analysis. Abeda Sultana

Abstract : Local government bodies are important organization to full-fill the local needs of the people created by the national government through law and ordinance. From the view point of political empowerment, women's participation and representation in the local government bodies are essential at the local level. For that reason present government placed a bill in 1997 for direct election of women for one-third of total seats in all local bodies. As a result women have been directly elected to Union Parishad, 110 women in general seats and 20 members as Chairmen. Government has taken a good initiative to make room for women representation at grass-root level in local government with a view to bringing qualitative change in their life style and confirm their participation in local affairs. But in many cases it has been found that these elected female UP members are not exercising their power effectively, their status is marginal in decision-making process. For empowerment, effective participation in decision making is vital and in this way women can influence or be a part of policy formulation and decision making which have direct bearing on their lives. This is what we mean as empowerment. So for effective empowerment of women in Union parishad, training would be a very important tool in achievement these objectives. So to say, effective empowerment could be achieved only by competent and trained women representatives. Thus this article attempts to show the importance and role of training for women empowerment in Union Parishad.

স্থানীয় রাজনীতি ও তৃর্ণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের জন্য সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। এ

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ইউনিট হচ্ছে জেন্ডার সম্বলিত কার্যকরী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা। কারণ নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব ছাড়া সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ এর আগে পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে কার্যকর নারী প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে মনোনয়ন বা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নামসর্বস্ব নারী প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক ক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে (GOB, 1997)। উদ্দেশ্য মূলত তৃর্ণমূল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ, স্থানীয় সম্পদ আহরণ, কর্মসূচি প্রণয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে স্থানীয় নারীদের সরাসরি সর্বাত্মক অংশগ্রহণ তথা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ। আমরা জানি ১৯৯৭ সালের নির্বাচনেই প্রথম মহিলারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারপার্সন ২০ জন। ১১০জন সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮জন নির্বাচিত হয়েছেন (জনকণ্ঠ, ১৯৯৯)। নারীর অগ্রযাত্রায় এটি নিঃসন্দেহে একটি নতুন মাত্রার সংযোজন। কিন্তু বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট সেটি হচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর কার্যকর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা প্রান্তিক। তাই এ প্রবন্ধে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা শীর্ষক একটি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থাকবে।

বিশ্লেষণের বিষয়বস্ত, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন, বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা, প্রেক্ষাপট, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যবৃন্দ। এ লক্ষ্যে প্রবন্ধটিকে ৩টি অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অংশে ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও নারীর সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে প্রশিক্ষণ এবং

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তৃতীয় অংশে ইউপিতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের চিত্র এবং এ প্রতিনিধিত্বের বাস্তব কার্যকারীতা বিষয়ক কিছু তথ্য চিত্রের উপস্থাপন এবং অকার্যকারিতা দূরীকরণ এবং ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্লেষণকর্মটিতে মূলত গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন জার্ণাল, দৈনিক পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র, সমীক্ষা ও অন্যান্য প্রকাশনাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

সাধারণভাবে বলা যায় "Empowerment refers to give or deliver power to do something or to act" অর্থাৎ কাউকে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর বা প্রদান করাকে ক্ষমতায়ন বলে। ক্ষমতায়নের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায়, "empower" ক্রিয়াটিকে Websters II New Rivisside University Dictionary এবং Funk and Wagnalls Canadian College Dictionary তে বলা হয় "invest with legal power" "to authorize" and "to enable" অর্থাৎ আইনসঙ্গতভাবে ক্ষমতা চর্চা, কর্তৃত্ব প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ ব্যবস্থা প্রদান।

ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। "ক্ষমতায়ন" হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং অন্যকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। ক্ষমতায়নের অর্থ হল যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সব বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাদপদ অবস্থায় রাখে তা থেকে উত্তরণ। এই যৌথ প্রচেষ্টায় পুরুষও অংশীদার। ক্ষমতার জন্য পুরুষদের সঙ্গে নারীর বৈরীমূলক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা নয়। এ প্রচেষ্টা হলো নারীর শক্তি সঞ্চয় করার জন্য পুরুষকে সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করা। আর নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত আলোচনার আদর্শিক ধারণা হলো পুরুষদের সঙ্গে সহ

অবস্থানে, সম মর্যাদায় নারীর অবস্থান প্রয়োজন, কেননা নারীও সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক। অথচ সমাজের যে সকল কর্মকান্ডে নারী নিয়োজিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী সমাজে যথাযথ মূল্যায়নে অধিষ্ঠিত হবে। "ক্ষমতা" মানুষকে সামাজিক স্বীকৃতি, মর্যাদা, সম্মান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, মূল্যবোধ ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। একারণেই বলা হয়, "Empowerment had acquired a considerable aura of "respectability" even "social status" within the vocabulary of development" (Tandon, 1995 : 31)। জ্ঞান, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হল ক্ষমতায়ন। অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়ঃ

১. বস্তুগত সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে, স্থানিক সম্পদ যেমন, জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি, মানবিক সম্পদ যেমন, মানব দেহ এবং আর্থিক সম্পদ, যেমন-অর্থ;
২. বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ যেমন, জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি;
৩. আদর্শিক সম্পদ যেমন, একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;– এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা (রহমান, ১৯৯৭ ঃ ৯০-৯১)।

ক্ষমতায়ন এভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করে। যার ফলে ক্ষমতাবান নিজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতার অধিকার থেকে। ক্ষমতায়ন এভাবেই ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে।

তবে নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রক্রিয়া হিসেবে নারীর

ক্ষমতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং অবিভাজ্য ধারণা (indivisible concept)। এক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যদি প্রয়োজনীয় শর্ত হয় তবে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন পর্যাপ্ত শর্ত এবং দুটি শর্ত পূরণ হলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফসল হিসেবে নারী সচেতনায়িত হলেও নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারী নীতি নির্ধারণে নারী প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত না হওয়ায়। এ সকল প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায়ন বলতে সে ধরনের দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জনকে বুঝায় যার মাধ্যমে বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা দূরীকরণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি সচেষ্ট হতে পারে।

উন্নয়ন সাহিত্যে এরই আলোকে ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়, "Good governance, legitimacy and creativity, for a flourishing private sector, transformation of economies to self-reliant, endogenous, human center development; promotion of community development through self help with an emphasis on the process rather than on the completion of particular projects; a process enabling collective decision-making and collective action; and, popular participation, a concept that has gained popularity within the development agenda." এ উপাদানগুলো ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকগুলোকেই নির্দেশ করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে "empowerment affirm the need to build the capacity of communities to respond to a changing environment by inducing appropriate change internally as well as externally and through innovation" (Singh, 1995 : 13)। অধিকন্তু "Political empowerment is not only for sharing policy and decision making but also for the survival of women with dignity and to project and promote basic human rights of women" (UP, 2000 : 67)। আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যায়- "Empowerment means strengthening the meaning and reality of the principles of "inclusiveness" "transparency" and "accountability" held in common with notions of democracy and sustainable develop-

ment. The concept goes beyond the notions of democracy, of human rights, and of participation to include enabling people to understand the reality of their environment (social, political, economic, ecological and cultural) to reflect on the factors that their environment and to take steps to effect changes to improve their situation (Sing, 1995 : 13).

এক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন বলতে নারীর ক্ষমতায়নকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে, বিরাজমান সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈষম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। সর্বোপরি আপন শক্তিমত্তা অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝানো হচ্ছে। একজন মানুষ যখন জীবন নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে- এ অবস্থাটিই হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক বিদ্যামান। যিনি অর্থনৈতিকভাবে কারো উপর নির্ভর না করে নিজের সংস্থান করতে পারেন, অন্যের কাছে যার নির্ভরশীল হতে হয় না তাকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান বলবো। সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যখন একজন মানুষের জন্য অভিগম্যতা (access) সৃষ্টি হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যখন সে সুফল ভোগ করতে পারে তখন তার সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়। একজন ব্যক্তি যখন রাজনৈতিকভাবে মতামত দিতে পারে, ভোট দিতে পারে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে তখন আমরা তার এ অবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন বলবো। মানুষের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষমতায়নের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর প্রসঙ্গে, "ক্ষমতায়ন পদ্ধতি" (Caroline, 1991 : 106-7) প্রথম বিশ্বের নারী গবেষকদের থেকে যতটা না তার চেয়ে বেশী তৃতীয় বিশ্বের তৃণমূল সংগঠন

(Grassroots organisations) এবং নারীবাদী লেখক ও নারীদের মধ্য থেকে উৎসারিত। ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং পরিবার যে নারীর অধস্তনতার উৎস এটা বলে থাকে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে, নারীর প্রতি নির্যাতনের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের বর্ণ, শ্রেণী, ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিমন্ডলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন। যা এটাই নির্দেশনা দান করে যে, নারীকে একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান নির্যাতনমূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে (গুহঠাকুরতা, ১৯৯৭ ঃ ১৮০)।

যখন ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারী ক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় তখন তা অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে নয়। এক্ষেত্রে তা নারীদের নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। এই স্বনির্ভরতা ও অভ্যন্তরীণ শক্তি কীভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে তা নির্ভর করে নারী তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্পগুলো গ্রহণ করতে পারছে কিনা এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত ও অবস্থানগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে নিজ জীবনের পরিবর্তন আনয়ন করতে পারছে কিনা তার উপর। অর্থাৎ নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে কি না।

Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) নারীর ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন করেছে। DAWN ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন এর আগে কিছু নারী ব্যক্তিত্ব এবং নারী সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারী সমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা নয়। বরং একটি বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা গঠনে চিন্তাশক্তি গঠন করা। যার মূল উদ্দেশ্য এমন এক পৃথিবী গঠন করা যেখানে প্রত্যেকটি দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সম্পর্ক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকবে না। এই ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা এসে পড়ে। যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে।

বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্যের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুটো বিষয় কাজ করছে। প্রথমত নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা-ক) দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে : (খ) দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে ; (গ) ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার- (ক) সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন,-অর্থ, ঋণ, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, অবকাশ ও বিনোদন ইত্যাদি; (খ) পছন্দের ক্ষেত্রে যেমন-নিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা, জীবন যাপন, সন্তান ধারণ ও লালন পালন ইত্যাদি; (গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন-ক্ষমতা ও নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি। যে প্রক্রিয়া এ সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাই হল নারীর ক্ষমতায়ন।

সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর ইস্যু নয় এটি একটি সামাজিক বিষয়, কারণ এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে নারী পুরুষ উভয়েই। নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি প্রদান ও সমতা অর্পণ করে এবং পুরুষকে প্রথাগত নিপীড়নকারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে। অধিকন্তু নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। কারণ এর ফলে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলোর পরিবর্তন হবে এবং বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদ লাভ এবং এসবের নিয়ন্ত্রণে নারী সক্ষম হয়ে উঠবে।

প্রশিক্ষণ ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা

কোন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগযোগ্য বস্তুগত সম্পদের পর্যাপ্ততার পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদের প্রাচুর্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্ব স্ব দায়িত্বের প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ্যতা এবং দক্ষতার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে হয়। প্রশিক্ষণ তাই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র এবং সমাজ সকলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইউএনডিপির Human Development Report-এ বলা হয়েছে মানব সন্তান সুনির্দিষ্ট কিছু সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে সকলেই তাদের যোগ্যতার প্রসার ঘটাতে পারে (UNDP, 1994 : 13) । আর একটি

সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগত্যা বাড়ানোর প্রক্রিয়াই মানব সম্পদ উন্নয়ন (Verma, 1992 : 14)। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা বিষয়ে আরও উল্লেখ করা যায়- There is a Chinese proverb that says, "If you are thinking one year ahead plant rice, if your are thinking ten years ahead plant trees, if you are thinking a hundred years ahead, develop your manpower through education and training" (Mostakim, 1995 : 23)। প্রশিক্ষণ প্রশাসন কর্তৃক এরূপ একটি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন কর্মী তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন এবং চিন্তা, কাজ, জ্ঞান, নৈপূণ্য এবং কর্মপ্রবণতা বিকাশের মাধ্যমে অধিক দায়িত্বশীল কার্য সম্পাদনে এগিয়ে আসতে পারেন।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ এক কথা নয়। আবার এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য টানাও সহজ নয়। আমরা জানি, প্রশিক্ষণ বলতে অংশগ্রহণকারীর কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত সুসঙ্গত কার্যক্রমকে বোঝায়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এক কথায় ইংরেজী "ASK" দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এখানে 'A' দ্বারা Attitude (মনোভঙ্গি) 'S' দ্বারা Skills (দক্ষতা) এবং 'K' দ্বারা Knowledge (জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ অবশ্যই বৃত্তিমুখী এবং কর্মকেন্দ্রিক হবে। প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য কোন নির্ধারিত বিষয়ে জ্ঞান এবং দক্ষতার উন্নয়ন। কিন্তু জ্ঞান উন্নয়ন প্রত্যয়টির মধ্যে একটি অনির্দিষ্ট ব্যাপকতার ইঙ্গিত রয়েছে। প্রশিক্ষণ জ্ঞানের পরিধিকে একটি নির্দিষ্ট কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করে তাকে সীমিত করেছে। সুনির্দিষ্ট পরিধিতে আবদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে শিক্ষা একটি ব্যাপক প্রত্যয়। সুতরাং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায়ও শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। কারণ- Training is not about knowing more, but for behaving differently, then the role of education become self evident. While the overall process of education imparts knowledge, training is the component, which enables us to learn how to behave differently. The entire process of empowerment is essentially

about changing the way the powerless and powerful behave. The skill required to bring about the change has to be earned through training. Learning to apply knowledge to affect changes in real life situations and acquiring the skills needed to do so, is the essence of training for empowerment. এক্ষেত্রে আরো বলা যায় নারীর জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা, যার মাধ্যমে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, কেন তারা সমাজে অধস্তন? আর এই অধস্তনতার শিকড় নিধনে তাদের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখা উচিত? তাই শুধু শিক্ষা অর্জনই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, সকল সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের "সচেতন" সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যবহারই পারে এ অধস্তনতার মূল উৎপাটনে তাদের যোগ্য করে তুলতে। Training must not only empower them to do so, but also impart tangible skills which will support women in the process of change, and empowerment cannot be taught, it must be experienced. If one can experience it, one can perhaps become a catalyst for others to do so as well. Thus, the process and experience of empowerment must begin right with the training itself which means a whole new approach, and the need to create means and methods to make this possible (Saha, 2000 : 51).

সুতরাং সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি, উন্নয়নের সহায়ক দক্ষতা বৃদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বৃদ্ধির সাথে জড়িত। কাজেই আমাদের ইতিবাচক মনোভঙ্গী ও মূল্যবোধ গঠনে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে কারণেই বলা হয়, Training equips the people with the requisite organizational goals. তাই সাম্প্রতিককালে ক্ষমতায়ন বিশেষ করে নারী প্রশ্নে ক্ষমতায়ন উন্নয়ন ডিসকোর্সের একটি কেন্দ্রবিন্দু (Focal Paint) হিসেবে আবির্ভূত এবং এ লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্বগঠন

আমরা জানি নেতৃত্বহীন সংগঠন মানুষ ও যন্ত্রের এক বিশৃংখল সমাবেশ। গোষ্ঠির সদস্যদেরকে লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করার যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব। গোষ্ঠিকে একক করার এটি একটি মানবিক উপাদান। এই উপাদান লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে নেতৃত্ব সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে এবং বিশেষ করে সংগঠন ও এর সদস্যদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে সফলতায় রূপ দেয়ার চরম দায়িত্ব বহন করে। কোন আইন বা নীতির বাস্তবায়নই একজন নেতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নয়, বরং সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিবিশেষকে অনুপ্রাণিত করাও নেতার একটি বিশেষ দায়িত্ব। জনগণের অনগ্রসরতা, বহুমুখী চাহিদা, উন্নতমানের জীবন যাত্রার প্রবল প্রত্যাশা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা প্রশাসনিক নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য করে তুলেছে। আর প্রশাসনিক নেতৃত্ব জন্মগত নয়, নেতৃত্বকে সৃষ্টি করতে হয়। নেতৃত্ব একটি কলা ও নৈপুণ্য। জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একে অর্জন করা যায়। নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি সাধন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব।

আমরা জানি প্রশাসকদের জন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রধানতঃ দু'ধরনের। প্রবেশপূর্ব ও প্রবেশোত্তর। প্রবেশপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নব নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের পরিচিত করা এবং প্রবেশোত্তর প্রশিক্ষণ দ্বারা কারিগরী ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন দায়িত্ব বহন করার জ্ঞান ও নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়া হয়। সংক্ষিপ্ত সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেও প্রশাসকগণ নিজেদের কর্মক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা জানতে পারেন এবং তা দূর করার জন্য পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান ও নৈপুণ্যের সন্ধান পেতে পারেন। যে কোন সংগঠনকে দক্ষভাবে পরিচালনা করতে হলে সংগঠনের কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও জনসংযোগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা জানতে হলে তাকে মানব সম্পর্ক ও আচরণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রশাসনিক নেতৃত্বের ভিত্তি আদেশ নয় বরং লোকদের কাজ করার জন্য বুঝিয়ে বলা। লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হলে একজন প্রশাসককে সুবক্তা, সুলেখক ও সদালাপী হতে হবে এবং এগুলো অর্জনের জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আজ থেকে অনেককাল আগে রাষ্ট্রদর্শনের গুরু প্লেটো "গণতন্ত্রকে অজ্ঞতা এবং অযোগ্যতার শাসন (Rule of ignorance and incompetance)" বলে অভিহিত করিছিলেন। তাঁর মতে গণতন্ত্র হচ্ছে মূর্খের শাসন কারণ এক্ষেত্রে শাসন পরিচালনাকারীদের কোন প্রশিক্ষণ নিতে হয় না। অথচ একজন কারিগরকেও তার কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে হয় (Sabine, 1959 : 43)। এ কারণেই ১৯৯৭ এর ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন প্রাক্কালে নব নির্বাচিত ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই তাসমিমা হোসেন বলেন "এই বারো হাজার মেম্বরকে যদি কোন না কোন প্রসেস এর মাধ্যমে সচেতনতা বা এ্যাডভোকেসী প্রোগ্রামের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আনা যায় তাহলে আগামী পাঁচ বছরে তৃণমূল পর্যায়ে বাংলাদেশে নারী শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আশা করা যায়" (হোসেন, ১৯৯৭ ঃ ১৭। বিল্ডিং ক্যাপাসিটি ফর লোকাল গভরনেন্স প্রকল্পের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ডঃ সৈয়দা রওশন কাদির এবং নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীরও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন (পারভেজ, ১৯৯৯ ঃ ২৩)। এরই সূত্র ধরে বলা যায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের কার্যকর ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এসব কিছু অর্জন সম্ভব সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

স্থানীয় সরকার কাঠামো ঃ ইউনিয়ন পরিষদ

Local Government is the yard stick of Good Governance. যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যতটা শক্তিশালী ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল, সে দেশে গণতন্ত্র ততটাই বিকশিত রূপে প্রতিফলিত। এ কারণেই একটি শক্তিশালী কার্যকরী, দক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় পর্যায়ের সরকার সুশাসনের চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ফলে যে সরকার গড়ে উঠে তাতে নেতৃত্ব বিকশিত হয় তৃণমূল পর্যায় থেকে, জনগণের অংশগ্রহণও এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিশ্চিত হয়, স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং

স্থানীয়ভাবে জবাবদিহী মূলক প্রশাসনও গড়ে উঠে। সে জন্যই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানই সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাত্রা। কেননা এটি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের ধারায় (অনুচ্ছেদ ৯) উল্লেখ করা হয়েছে- "The State shall encourage local Government institutions composed of representativs of the areas concern and in such institutions special representation shall be given, as far as possible, to peasant, workers and women" (GOB, 1972)। সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদে যথাযথ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমেই তৃণমূল পর্যায়ে বিশাল জনগোষ্ঠিকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্তকরণ সম্ভব।

ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। বিবর্তন ও পরিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানের নামের যেমন পরিবর্তন হয়েছে একাধিকবার তেমনি পরিবর্তিত হয়েছে এর কার্যক্রম এবং দায়িত্বাবলী। সকল পরিবর্তনের মধ্যে প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল করার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য নির্বাচনের শুরু ষাটের দশকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের পূর্বে মহিলাদের স্থানীয় সংস্থায় ভোট দানের অধিকার ছিল না (Rashiduzzman, 1968 :6)। ১৯৬৫ সালে সর্বজনীন ভোট প্রথা চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোট দানে সক্ষম হন। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। এ অধ্যাদেশে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের দু'জন মহিলা প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা তিনজন করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আবার পরিবর্তন আসে। এবার ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন সাধারণ সদস্য এলাকাবাসীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। নারীদের জন্য

সংরক্ষিত ৩টি আসন বজায় থাকে। কিন্তু তাতে মনোনয়নের পরিবর্তে তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। এ হচ্ছে ১৯৯৭ পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ

শতবর্ষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ৩০ বছরে সর্বমোট ৬টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭ সালে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ৪,৩৫০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র একটি ইউনিয়ন পরিষদে (রংপুর) ১জন মহিলা চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে ৪জন মহিলা চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে ৪,৪০০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ৪জন এবং পরবর্তী ইলেকশনের মাধ্যমে আরো ২জন অর্থাৎ মোট ৬জন চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালে ৪,৪০১টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী ছিল ৭৯জন, এদের মধ্যে মাত্র ১জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯২ সলে ৪,৪৫০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলেন মোট ১৭,৪৪০জন, এদের মধ্যে ১১৫জন ছিল মহিলা। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সাল নাগাদ মহিলা চেয়ারম্যান এর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪জন (Qadir, 1994 : 6) । আর ১৯৯৭ সালেই সর্বপ্রথম মহিলারা প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। এ নির্বাচনে মহিলা চেয়ারপার্সন ২০জন, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন, ১৯৯৭এর ডিসেম্বর নাগাদ। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ১৩,৪৩৭জন মহিলা এবং চেয়ারপার্সনের সংখ্যা ২৩জন (GOB, 1999)। ১৯৯৭ পর্যন্ত ইউপি নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী ১। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে নারী

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	নারী প্রার্থী	নির্বাচিত নারী চেয়ারপার্সন
১৯৭৩	৪,৩৫২	–	১
১৯৭৭	৪,৩৫২	–	৪
১৯৮৪	৪,৪০০	–	৪+২=৬
১৯৮৮	৪,৪০১	৭৯	১ (১% প্রায়)
১৯৯২-১৯৯৩	৪,৪৫০	১১৫	১৩+১১=২৪ জন
১৯৯৭-১৯৯৯	–	–	২০+৩=২৩ জন

সূত্র ঃ নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ও ডঃ সৈয়দা রওশন কাদির এর প্রবন্ধ এবং দৈনিক জনকণ্ঠ ১০মে, ১৯৯৮।

উপরের চিত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৯৭ কিছু সংখ্যক নারী প্রতিনিধিকে দৃশ্যতঃ ক্ষমতায়িত করেছে বটে, কিন্তু বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে তাদের যথার্থ ক্ষমতা প্রয়োগে যে প্রতিবন্ধতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা স্পষ্ট (আবেদা, NILG : 56)। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা থেকে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র তুলে ধরা হলো।

ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, সরাসরি ভোটে ইউপি সদস্য হয়েছেন এমন ৪৭% মহিলা বলেছেন, "জনগণকে তারা যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে সব বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। এমএমসি নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ২০টি থানার ৬৩টি ইউনিয়নের ৩৩৬টি ওয়ার্ডে একটি জরিপ পরিচালনা করেন। মোট ১০৮জন মহিলা ইউপি সদস্যের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ শেষে গবেষকরা দেখেছেন ৭১% মহিলা সদস্য জানেন না তাদের পরিষদের বাজেট কত? তবে ৭৩% মহিলা সদস্য আবারও নির্বাচন করতে ইচ্ছুক এবং ৯০% আবারও নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

জরিপে দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা সদস্যরাই (৫৫%) কেবল স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। প্রায় ৫৭% পূর্বে বহির্জগতের কোন পেশাতেই ছিলেন না। এসব নারীকে এখনো পারিবারিক কাজে সপ্তাহে ২০ থেকে ৪০ ঘন্টা সময় দিতে হয়। সে কারণে ইউপির কাজে পর্যাপ্ত সময় পান না। নিজের নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে ধারনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ইউপি নারীদের প্রশ্ন করা হলে দেখা যায় ২৫% এলাকা সম্পর্কে স্পস্ট ধারণা রাখেন, ৫৪% এর ধারণা মোটামুটি এবং ২১% এর কোন ধারণা নাই। নিজ এলাকার নারীদের কোন সমস্যা আছে কিনা এর উত্তরে ৮৯% বলেছেন আছে। বাকীরা বলেছেন কোন সমস্যা নাই। যারা সমস্যা আছে বলেছেন তাদের ৬৫%-এর সমস্যা সম্পর্কে ধারণা নেই। কার ইচ্ছায় নির্বাচন করেছেন এর উত্তরে মাত্র ১৩% বলেছেন নিজের ইচ্ছার কথা। অধিকাংশ অন্যের ইচ্ছা ও সহযোগিতায় নির্বাচন করায় ইউপির কাজের ধরন ও কর্তব্য সম্পর্কে এদের ধারণা ও আগ্রহ কম (হোসেন, ২০০০)।

সুতরাং স্পষ্টতঃই প্রমাণিত যে, ইউপি নির্বাচন ১৯৯৭ কিছু নারী প্রতিনিধিকে দৃশ্যতঃ ক্ষমতায়িত করছে, কার্যতঃ নয়। ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে প্রকৃত ক্ষমতায়ন বলা যায় না কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ক্ষমতা প্রান্তিক। তাই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন অর্জনে প্রশিক্ষণ এ মুহূর্তে অন্যতম উপায় যার মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব। আধুনিককালে উন্নয়ন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন যা দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব আর এই দক্ষ জনবল সৃষ্টির মূল হাতিয়ার হচ্ছে প্রশিক্ষণ। এ কারণেই "Training has long been recognised as an important input to econumic development" (GOB 1986)। এক্ষেত্রে আরো বলা যায় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিক অর্থে প্রকৃত ক্ষমতায়ন কার্যকরণেও প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইউপি সদস্যদের ক্ষমতায়ানে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ছাড়া ইউপিতে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। এনজিওরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু ব্যবস্থা নিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নির্বাচিত এসকল সদস্যদের

প্রশিক্ষণের প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা তেমন জোরালো নয় এবং এক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ কম থাকায় ক্ষেত্রটি অবহেলিত। এলক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর যথেষ্ট ভূমিকা নির্ধারণ প্রয়োজন। তাছাড়া থানা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কেন্দ্রেও ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নব নির্বাচিত ইউপি সদস্যগণ আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র, শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর এবং সার্বিক উন্নয়ন থেকেও বঞ্চিত। নব নির্বাচিত এই সদস্যদের অনেকেই রাজনীতিতে আনকোরা আর জন সংগঠনেও অদক্ষ, ফলে সঠিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই দায়িত্ব গ্রহণের প্রতি সদিচ্ছা জাগ্রত ক্রমবর্ধমান কর্মশক্তি বৃদ্ধিকরণে অনুপ্রাণিত করা, উত্তম শ্রোতা ও উত্তম কাজের প্রশংসা, ক্ষমতার সদ্ব্যবহার, অকপট দোষ স্বীকার ও সহযোগিতা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাদের মাঝে যথার্থ নেতৃত্বের এ সকল গুণাবলী অর্জন সম্ভব। যেমন উদারমনা, ধৈর্যশীলতা, কষ্ট সহিষ্ণু, সাহসিকতা, কর্মপ্রেরণা, মনোভাব ও অভ্যাসের অংশীদারিত্ব, চরিত্রের পূর্ণতা, সামাজিকতা, সততা, সমবেদনাবোধ, জ্ঞান অর্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সমাজে একজন ইউপি সদস্যের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া একটি নির্মম সত্য এই যে, ইতোমধ্যে ৪জন নির্বাচিত নারী সদস্য ধর্ষিতা হয়েছে এবং আরও অনেকে যৌন হয়রানীর সম্মুখীন হয়েছেন (উন্নয়ন পদক্ষেপ, ২০০০ ঃ ৪৩)। এ থেকে এটিই প্রমাণিত যে, সমাজে একটি শ্রেণীর কাছে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সামাজিক অগ্রহণযোগ্যতা (non-acceptance) এবং তাদের ক্রমবর্ধমান অসহায়ত্ব পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। সুতরাং নারী সদস্যদের আত্মরক্ষাকল্পে প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কেও প্রশিক্ষণে জোর দিতে হবে। অধিকন্তু ব্যবস্থাপনার কৌশল শিক্ষণে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক কলা-কৌশলকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যথার্থ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে নারী সদস্য তথা নারীরা সমাজে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তথা নারীর ক্ষমতা

সম্পর্কে ইউপি সদস্যদের ধারণা অস্বচ্ছ। সমাজে নারীর অবস্থান যে অসম এবং এটা যে ন্যায়সঙ্গত নয় সে বিষয়ে তারা একমত কিন্তু এ বিষয়ে তাদের মনে বা কার্যক্রমে কোন বিশেষ গুরুত্ব পায় না। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার ইস্যুগুলোকে প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে।

কাজেই যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সমাজের এই পিছিয়ে পড়া জনশক্তিকে এগিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব। তবে এ লক্ষ্যে ইউপি সদস্যপদে প্রার্থী লাভের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। নতুবা যথার্থ প্রশিক্ষণের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হবেনা এবং এটা সত্য যে, Training should facilitate an analysis of power structures with in the family, community local institutions, the state, thus, generating a critical understanding of whole has control over decision-making, over the community's resources, over the services provided by the state. এভাবে প্রশিক্ষণ লাভের মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠি তাদের জীবন অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়ার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হবে, পারস্পারিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা অর্জনের মাধ্যমে নিজ কর্মক্ষেত্রে যথার্থ ক্ষমতা ও অধিকার ভোগে সক্ষম হবে। অধিকন্তু এর ফলেই এ সকল দরিদ্র নারী তাদের ক্ষমতাহীনতা, অধিকার হীনতা ও বঞ্চনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে সমর্থ হবে। ফলে তারা তাদের যথার্থ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে। পরিষদের কার্যাবলী, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সদস্যদের যথাযথ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ না থাকায় বিভিন্ন বিষয় তারা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছে না। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে নব নির্বাচিত মহিলা সদস্যসহ পুরুষ সদস্য এবং চেয়ারম্যানদের যথাযথ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করা দরকার। সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের ফলেই সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানার পাশাপাশি অন্য সহকর্মীকে সহযোগিতা দানের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হবে।

উপসংহার ও করণীয়

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী অংশগ্রহণের সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের এই সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তরে জেন্ডার মাত্রা সংযোজিত

হয়েছে বলা যায়। তবে সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল এ সকল জনগোষ্ঠিকে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রে নেতৃত্বদানের জন্য যোগ্য করে তুলতে পারলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন অর্জিত হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র সচেতনতা, সুশাসন ও সর্বোপরি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে যথাযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠলেই গ্রাম থেকে পরবর্তীতে ধাপে ধাপে প্রতিটি স্তরে যথার্থ অর্থেই নারীকে করবে ক্ষমতায়িত। ক্ষমতায়নের জন্য অংশগ্রহণ বৃদ্ধি প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তবে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি আর ক্ষমতায়ন এক নয়। ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নকে সংগঠিত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে এবং নারী সমস্যাকে তুলে ধরে সচেতনতা সৃষ্টি ও সর্বোপরি নারী পুরুষ সমতা সৃষ্টির (যা নারীর ক্ষমতায়নের মূল স্তর) লক্ষ্যে নিম্নে কিছু করণীয় নির্দেশ করা হলোঃ

১) প্রকৃত শিক্ষাই সচেতনতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। সে জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা নিতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি টিমে এনে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে "মোটিভেশন ক্লাস" গ্রহণ করতে হবে। ফলে এ ধরনের কার্যক্রমের অধীনে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি তথা পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা, আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২) প্রশিক্ষণ কার্যে বিভিন্ন এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। তাদের পরিচালিত সেমিনার, মিটিং এবং কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যেন উপস্থিত থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গর্ভন্টমেন্ট এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে এবং সর্বোপরি কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ পন্থা উদ্ভাবন, কীভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কোন কোন বিষয়গুলো এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে সে লক্ষ্যে জোর গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই পন্থা নির্ধারণ জরুরী।

৩) সামাজিক ও ব্যবহারিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য নারী সদস্যদেরকে মত বিনিময় ফোরাম অন্যান্য গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও কার্যক্রম অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের জনসম্মুখে কথা বলার অভ্যাস বাড়াতে হবে। জনগণের সমস্যা খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে উঠবে। ব্যক্তি পর্যায়ে এ সকল চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে পারিবারিক সমর্থন। আর এ সকল বিষয়ও প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪) সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে নারীকে। মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য দূর করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী সমাজকে সচেতন থাকতে হবে। দেশীয় আইন ও নীতির বাইরে যে সকল অসামাজিক শক্তি, ধর্ম ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে নারীর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার কাজে লিপ্ত, তাদের দমন করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির আওতায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সুসংহত করতে হবে। সে কারণে প্রশিক্ষণে এ সকল বিষয়গুলো স্পষ্টকরণে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংযোজন করতে হবে।

৫) দারিদ্র্য নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধক। যে সকল নারী ইউপিতে কিছুটা ক্ষমতা চর্চা করতে পারছে তারা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা উন্নত। নারীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। নারীকে স্বনির্ভর হবার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পুঁজি সৃষ্টি ও সমৃদ্ধ ঋণদানের ব্যবস্থা করে দুঃস্থ, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬) নারীর অধিকার সংরক্ষণে যৌতুক, তালাক, সন্তানের অভিভাবকত্ব, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনে যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনের সংশোধন করতে হবে।

পারিবারিক আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য গণমাধ্যমে এর প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। আইনের ক্ষেত্রে বিরাজমান অসমতা ও নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান সহিংসতা শুধু নারী সমাজের প্রতি হুমকী স্বরূপ নয় জাতীয় অগ্রগতির পথে বিরাট অন্তরায়। সর্বোপরি নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তনের জন্য জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে এনজিওগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে আরো সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা প্রয়োজন।

৭) অধিক সংখ্যক নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য মত বিনিময় ফোরামের ব্যবস্থা করতে হবে গ্রামাঞ্চলে। অধিকহারে নারীদের ভোট প্রদানের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে মহিলাদের ভোট প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থীকে নৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের এ সম্পর্কিত করণীয় নির্ধারণ করা উচিত।

৮) সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী নারীর সমকক্ষতা ও ক্ষমতায়নের দাবী দৈহিক নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। কাজেই সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে সমকক্ষতা অর্জনে মনস্তাত্ত্বিক বা চেতনার স্তরে আনতে হবে পরিবর্তন। নিশ্চিত করতে হবে আচরণগত সংস্কৃতি, উন্নত চরিত্রের মানদন্ড, যা অন্যের প্রতি বিবেচনার যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে করবে উন্নত। এ লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নেতৃত্বকে করতে হবে সফল যা সামাজিক ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত। ফলে নারী সদস্য সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হলে তা প্রভাবিত করবে তার পরিবারকে এর দ্বারা পরবর্তী প্রজন্ম নারীর প্রতি সম্মানজনক মনোভাব পোষণ করবে। তাই সামাজিক সংস্কার দূরীকরণে প্রশিক্ষণে "মোটিভেশন ক্লাস" গ্রহণ জরুরী। সে ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হবে। এভাবে লালিত হয়ে এক সময় পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে, আর এভাবেই নারী পৌঁছাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে।

তথ্য নির্দেশিকা

উন্নয়ন পদক্ষেপ (১৯৯৭) *উন্নয়ন ও জেণ্ডার বৈষম্য*। ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ঢাকা।

উন্নয়ন পদক্ষেপ (২০০০) *সম অংশীদায়িত্ব*। ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯তম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ঢাকা।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম সুরাইয়া (১৯৯৭) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন ঃপ্রসঙ্গ বাংলাদেশ। মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য (সম্পা.) *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি।* ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ।

দৈনিক জনকণ্ঠ। ১০মে ১৯৯৯।

পারভেজ, আলতাফ ও হক, মোজাম্মেল (১৯৯৯) দেশ জুড়ে ১৩ হাজার নারীর যুদ্ধ। তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত *"অনন্যা"* ১৬-৩০ এপ্রিল।

রহমান, শাহীন (১৯৯৭) *জেণ্ডার পরিভাষা শব্দ কোষ*। উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ঢাকা।

হোসেন, তাসমিমা (১৯৯৭) *অনন্যা,* ১-১৫ ডিসেম্বর।

হোসেন, মৌসুমী (২০০) *ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের ভূমিকা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা*। ৬ জুলাই, ২০০০ তারিখ এল. জি. ই. ডি. এর সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদন।

Caroline O. N. Mossier (1991) Gender Planning in the Third World Meeting Practical and Strategic Needs in Rebecca Grant and Kathleen New land (eds.) *Gender and International Relations*. Open University Press.

GOB (1972) *The Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh*, Dhaka.

GOB (1986) *Training Policy for the Government officials*, Dhaka : Ministry Establishment.

GOB (1997) The *Local Government (Union Parotids, Second Amendment) Act 1997*. Bangladesh Gazette additional paper, 8h September.

GOB (1999) *Local Government*, The department of Rural development and the ministry of CO-operative, 4th June.

Mostakim, Golam (1995) Civil Service Training in Great Britain

France and Bangladesh : Acomparative study, in journal of *BSTD*, vol. 2, No. 1 January-June.

Qadir, Sayeda Rowshan (1994) Participation of women at local level politics : Problems and prospects, in Najma Chowdhury and et. al. (eds.) *Women and Politics.* Dhaka : Women for Women.

Rashiduzzaman M. (1968) *Politics and Administration in the local Councils in East Pakistan.* London : Oxford University Press.

Sing, Naresh and Tiji, Vanglie (1995) *Empowerment : Towards sustainable Development.* Zed Books Ltd: London.

Saha, Tapati (2000) Training for Emporeerement, in Unnyan Podokkhep Vol. 5 No. 2 April-June.

Saline G. H. (1959) *A History of political Theory.* New Delhi : Prentice Hall.

Tendon, Yash (1995) Poverty, Processes of Impoverishment and Empowerment : A Review of current thinking and action, in Empowerment : Towards sustainable development. London : Zed Books Ltd.

UN (1966) *Hand book of Training in Public Service.* New York : UN Department of Economic and social Affairs.

UNDP (1993) Human Development Report 1993. London : Oxford University Press.

UNDP (1994) *Human Development Report 1994.* Delhi : Oxford University Press.

Unnyan Podokkep (200) April-June 2000 Vol. 5, No 2. Dhaka : Steps towards development.

Verma. M. M. (1989) *Human Resources Development strategic Approaches and Experiences.* Jaipur : Arrant Publishers.

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

উনবিংশ শতকের প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি

ড. এম এ মোমেন *

Council Orders and Notifications of 19th Century.

Dr. M. A. Momen

Abstract : William Tachkeray, grandfather of great English novelist William Macpiece Thackeray was collector of Sylhet and he amassed huge fortune exploiting his official position and indulged him in acquiring land for plantation for personal benefit. This is one of the many examples of civil servants in the colonial India abusing their position for individual gains. There are instances of officials who risked their job to ensure welfare of the masses during their tenures in public office. Circulars, notifications and orders issued by competent authorities, guided the conduct of the officials. This write-up draws from the big bunches of circulars, notifications and orders that not only shaped the conduct the civil servants but also laid the foundation public administration in nineteenth century. It also sheds light on social and cultural traits of people of Bengal. Although corruption and bribery were not rampant, one office order issued in 1851 instructed officials not to exchange residential addresses to service seekers or any other stockholders in the private sector. This brief write-up intends that interested researchers take up investigative study into this unexplored resource of 18th and 19th centuries.

ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারের পিতামহ উইলিয়াম থ্যাকারে সিনিয়র কোম্পানি আমলে সিলেট জেলার কালেক্টর ছিলেন। কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখলেন, সরকারি দায়িত্ব (কোম্পানির দায়িত্ব বলাই ভালো) পালনের সাথে সাথে চোখ কান খোলা রেখে ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা জায়গা মতো প্রয়োগ করতে পারলে অর্থের প্রবাহ রোধ করাই মুশকিল। তাছাড়া জেলার বড়োকর্তা কালেক্টরের টাকা কে মেরে খাবে? উইলিয়াম থ্যাকারে ব্যক্তিগত

---

* উপ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রাক্তন উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি।

কর্মচারী নিয়োগ করে এবং ঠিকা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে চাষাবাদ শুরু করেন, সাথে কিছু ব্যবসাও। বিষয়টি কোম্পানির সদর দফতর ভালোচোখে দেখেনি। নেটিভ এজেন্টের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মকর্তারা যাতে ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত না হয়ে পড়েন সে জন্য ফরমান জারি করা হয়। বেসরকারি লোকের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

সে সময়ই অফিসের কাজ বাড়িতে নেবার একটা প্রবণতা বৃটিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং নেটিভদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অফিসের কাজ বাসায় নেয়ার ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখা হতো না। বেসরকারি লোকজনের সাথে যে কোন ধরনের সরকারি কর্মসম্পাদন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে অফিসের বাইরের কোনো স্থানই সরকার ভালো মনে করে না। বিশেষ করে বিচার বিভাগের কর্মকর্তা অর্থাৎ বিচারক এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে তা নয়ই। ১৬জুন ১৮২৯ তারিখের পত্রে আদেশ জারি হলো- এখন থেকে বিচার ও রাজস্ব বিভাগের কোনো কর্মকর্তা দাপ্তরিক কাজ তাদের বাসভবনে সম্পাদন করতে পারবেন না। এই নিবন্ধে ঊনবিংশ শতকে জারিকৃত কিছু প্রজ্ঞাপন (সার্কুলার), আদেশ (অর্ডার) ও বিজ্ঞপ্তির (নোটিফিকেশন) সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে। লোকপ্রশাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এগুলি জারি করা হয়েছে।

১. ২৮ জুন ১৮৪৫, সার্কুলার নম্বর ৪৫৯

নির্দিষ্ট কোনো বিভাগে (ভৌগোলিক এলাকা অর্থে) কর্মরত কোন সরকারি কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সে বিভাগের মধ্যে বিভিন্ন স্থান সফর করাকালীন ফেরি পারাপারের দরকার হলে তাকে কোন প্রকার টোল দিতে হবে না।

২. ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১, সরকারী আদেশ নম্বর ২০৫৬

যাদের সাথে দাপ্তরিক কার্যক্রমের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোনো বেসরকারি সদস্যের কাছ থেকে কোনো কর্মকর্তা তার বাড়ির ঠিকানা নিতে কিংবা তাকে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারবেন না। অর্থাৎ বিজনেস কার্ড (তখন এর তেমন প্রচলন হয়নি) বিনিময় করা যাবে না।

৩. ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৬০, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩০৯

কোনো ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত/গ্রেফতার হওয়া মাত্রই সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হবেন।

৪. ৩১মে ১৮৬২, সিদ্ধান্ত নম্বর ৪৬

সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোনো কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হতে পারবেন না।

৫. ২ ডিসেম্বর ১৮৬২, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৬৮৭২

রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারগণ যে জেলায় কর্মরত, সে জেলায় কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে কোনো জমি ক্রয় বা অন্য কোনোভাবে অধিকার করতে পারবেন না।

৬. ১৮৬৪ সালের প্রজ্ঞাপন নম্বর ১০৬০টি (তারিখ উদ্ধার করা যায়নি)

জরিমানার অর্থ অনাদায়ের কারণে যে অপরাধীর ক্ষেত্রে কারাদন্ডের বিধান রয়েছে, সে অর্থ আদায় হওয়া মাত্রই কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তা অবহিত করাতে হবে, যাতে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে কারাগারে আটক করে রাখা না হয়।

৭. ১৫মার্চ ১৮৬৪ (প্রজ্ঞাপন নম্বরটি উদ্ধার করা যায়নি)

দোষী সাব্যস্ত অপরাধীকে যদি চাবকানোর দন্ড দেয়া হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে, প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীর উপর প্রয়োগের জন্য যে ছড়ি ব্যবহার করা হবে তার ব্যাস কোনোক্রমেই এক ইঞ্চির বেশি হতে পারবে না।

৮. ৬ আগষ্ট ১৮৬৫, প্রজ্ঞাপন নং ৭২৬৭

বিশেষকরে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে উমেদার রাখার একটি প্রথা এখনো চালু আছে। ভবিষ্যতে চাকুরি হবে এই ভরসায় চতুর্থ শ্রেণীর পদের জন্য অনেকেই বছরের পর বছর বেগার খেটে থাকেন। চাকুরি হয়ে গেলে অবশ্য বেগার খাটার কষ্টটা থাকে না। এই প্রথাটি বহু আগে থেকেই চালু ছিলো। একসময় দেখা

গেলো ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও ডেপুটি কালেকটরগণ বহু সংখ্যক উমেদার গ্রহণ করছেন এবং ব্যক্তিগত কাজেও তাদের লাগাচ্ছেন। ৬ আগষ্ট ১৮৬৫ এর প্রজ্ঞাপনে নির্দেশ দেয়া হলো, একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর তার অফিসে দুই জনের বেশি শিক্ষানবিশ কর্মী রাখতে পারবেন না।

৯. ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫, পত্র নং ১৫৭৭টি

যে সকল ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেট জজদের আদালত জেলা জজ আদালতের বাইরে ভিন্ন দালানে অবস্থিত, সেখানে মাসে পাঁচ টাকা বেতনে একজন চৌকিদার নিয়োগ করা যাবে।

১০. ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬, পত্র নম্বর ২০২০টি

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের মতো মুন্সেফরাও পাঙ্খা পুলার (পাখা টানার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি) পাবেন।

১১. ১৮ অক্টোবর ১৮৬৭, পত্র নং ৫৬৩৮এ

অন্য মামলা চলাকালীন সময়েও পুলিশ ইনসপেক্টর ও সাব ইনসপেক্টর বসার অনুমতি পেতেন না। উপর্যুক্ত পত্র জারির পর থেকে বসার অনুমতি দেয়া হয়।

১২. ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৮, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৭৩

স্বাস্থ্যগত কারণে মেডিক্যাল অফিসারগণ সরকারি কর্মচারীদের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বদলির সুপরিশ করতেন। বিষয়টি সরকার অনাকাঙ্ক্ষিত বিবেচনা করে এই প্রজ্ঞাপনে সকল সরকারি ডাক্তারকে জানিয়ে দেয়, তারা এ ধরনের সুপারিশ করতে পারবেন না। অসুস্থ হলে অবশ্যই অসুস্থ হিসেবে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে যদি অন্যত্র বদলী হলে তার স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রেও উক্ত কর্মচারী অসুস্থ ও দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত বলে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১৩. ৭ জুলাই ১৮৬৯, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৮৬৫

কোনো সরকারি কর্মকর্তা বেসরকারি কোনো প্রেসে কোনো দাপ্তরিক মুদ্রণের কাজ করতে পারবেন না।

১৪. ৩১ আগষ্ট ১৮৬৯, পত্র নম্বর ৩৯৮৬

জেলায় কর্মরত কোনো গেজেটেড অফিসার অসুস্থ হলে সিভিল সার্জন ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাকে দেখতে যাবেন। কোনো ফি আদায় করতে পারবেন না।

১৫. ২৪ জুন ১৮৭০, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৬৩

দেওয়ানি কিংবা ফৌজদারি কোনো আদালতে ধূমপান করা যাবে না।

১৬. ১১মে ১৮৭১, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২৪

যে সব কর্মকর্তা পাঙ্খাপুলারের দেয় বাতাস উপভোগ করার জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত তারা প্রতিবছর ১৫ মার্চ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত পাঙ্খাপুলারের সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে ইউরোপীয় অফিসাররা ১ নভেম্বর পর্যন্ত টানা পাখা ব্যবহার করতে পারবেন। বিচারক এবং কমিশনারগণ চাহিদা অনুযায়ী ১ মার্চ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন।

১৭. ৭ জুলাই ১৮৭১, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৮৬৭

কোনো সরকারি কর্মকর্তা জনস্বার্থে ব্যক্তিগত এজেন্ট নিয়োগ করে বা নিয়োগকৃত কোনো এজেন্টের মাধ্যমে কোনো প্রকার অর্থ আদায় করতে পারবেন না।

১৮. ৩ আগষ্ট ১৮৭১, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৪৯

সরকারি দায়িত্ব পালনকালে কোনো খাল অতিক্রম করতে হলে কোনো পুলিশ কর্মকর্তার টোল প্রদান করতে হবে না।

১৯. ৩১ অক্টোবর ১৮৭১, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪৬

বিচার বিভাগের কোনো কর্মকর্তার স্ত্রীর নামে জমি কেনা/গ্রহণ করা হলে তা উক্ত কর্মকর্তা নিজেই করেছেন বলে বিবেচিত হবে। তা হলে কি সরকার স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ক্রয় কিংবা গ্রহণের বিষয়টি তখন থেকেই সন্দেহের চোখে দেখতো? বিষয়টি নিয়ে গবেষকরা ভাবতে পারেন।

২০. ৩১মে ১৮৭৩, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৬৯

সরকারি কর্মকর্তারা যখন সফরে বের হবেন তখন যানবাহন ডাকার জন্য বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য সরকারি কর্মচারিকে নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু কর্মকর্তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেনো ঐ কর্মচারি (তার নাম ভাঙ্গিয়ে) কোনো প্রকার প্রতারণা বা অবৈধ আদায় না করে।

২১. ৯ জুলাই ১৮৭২, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২০

যার হাতের লেখা ভালো না তাকে লেখালেখি সংশ্লিষ্ট কোনো পদে নিয়োগ করা কিংবা ইতোপূর্বে কেউ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তাকে উচ্চতর পদে পদোন্নতি দেয়া যাবে না।

২২. ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২৯

সরকারের বিশেষ অনুমোদন না থাকলে কোনো সরকারি কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় অর্থে কোনো পত্রিকা বা সাময়িকী ক্রয় করতে পারবেন না।

২৩. ৮ মে ১৮৭৩, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৫৬

সকল অফিস সকাল এগারটার মধ্যে অবশ্যই খুলতে হবে এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজকর্ম চালাতে হবে।

২৪. ৭ এপ্রিল ১৮৭৬, প্রজ্ঞাপন নম্বর ১৯

সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা যে কোনো রাষ্ট্রীয় দলিলে (মামলার নথিসহ) স্বাক্ষরের সময় নাম স্পষ্টভাবে লিখবেন।

২৫. ২৪ জুলাই ১৮৭৬, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪০

কোনো সরকারি কর্মচারী কারো কাছ থেকে উপহার, দান, পুরস্কার, আর্থিক বা বস্তুগত বা অন্য কোনো ধরনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে কয়েকটি

ফুল বা ফল কিংবা অতি তুচ্ছ মূল্যের দ্রব্য নেয়া যেতে পারে। তবে এসব গ্রহণের ক্ষেত্রেও সরকার কর্মকর্তাদের নিরুৎসাহিত করছে।

২৬. ২৪ মার্চ ১৮৭৭, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২০

যে সব মুহুরি ইংরেজি জানেন না তাদের নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৭. ২৮ জুন ১৮৭৭, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৮

কোনো সরকারি ভবনে অবস্থান করলে কোনো কর্মকর্তা সরকারের দেয় বাড়ি ভাড়া উত্তোলন করতে পারবেন না।

২৮. ৫ আগষ্ট ১৮৮১, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২০

কোলকাতায় কোনো দফতরে চিঠি পাঠাতে হলে চিঠিতে 'ফোর্ট উইলিয়াম' লিখার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো মুদ্রিত খামে 'ফোর্ট উইলয়াম' লিখা থাকলে তা কলমে কেটে দিতে হবে। কেবল 'ক্যালকাটা' লিখলেই হবে।

২৯. ১৪ ডিস্মেবর ১৮৮১, প্রজ্ঞাপন নম্বর ৪৫

সরকারি সরবরাহ প্রদানকারী স্টেশনারি অফিস থেকে মোমবাতি সরবরাহ করা হবে না। স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে জরুরী ক্রয় খাত থেকে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে পরিশোধ করা যাবে।

৩০. ১৭ নভেম্বর ১৮৮২, প্রজ্ঞাপন নম্বর ২৬

যে সকল ফৌজদারি মামলায় মুসলমান বাদী, বিবাদী ও সাক্ষী রয়েছে, সেসব মামলার শুনানীর জন্য কোনো মুসলমানি ছুটির দিন ধার্যকরা যাবে না।

৩১. ২১ মার্চ ১৮৮৩, বিজ্ঞপ্তি

প্রশিক্ষণ অফিসার কিংবা ডেপুটি কালেক্টরের জন্য তৃতীয় ভাষায় পরীক্ষা পাশ করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যদি কেউ পরীক্ষা দিতে চান এবং পরীক্ষায় পাশ করেন তিনি ১৮০ টাকা পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৩২. ৩১ জুলাই ১৮৮৩, প্রজ্ঞাপন নং ২০

আইন, বিল, সার্কুলার ইত্যাদির গেজেটে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ খারাপ হলে অবিলম্বে তা সরকারকে জানতে হবে।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটিতে ১৮৪৫ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত সময়কালে জারীকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তির কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো। প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ এবং মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় এসব প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তিগুলোই ছিলো নিয়ন্ত্রক ও আইনগত ভিত্তি। এগুলো একদিকে যেমন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্বচ্ছ ছবি তুলে ধরে অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের অস্বচ্ছ ও ধুসর একটি জগতেরও ইঙ্গিত দেয়।

তথ্য নির্দেশিকা

Baden-Powell, B. H. (1892) *The Tand Revenue System of British India.* Oxford : Oxford University Press.

Bleckburn, Re. (ed) (1975) *Explosion in A Subcontinent.* Middlesex : Penguin.

Charlesworth, N. (1990) *British Rule and the Indian Economy 1800-1914.* London : Macmillan.

Ghose, C. N. (1882) *Hand-book of the Circulors, Orders and Notification.*

Hunter, W. W. (1894) *Bengal MS Records.* Vol. 1. London : W. H. Allen and Co. Ltd.

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বাংলাদেশঃ একটি পর্যালোচনা

মেহেদী মাসুদ *

Security of small states and Bangladesh : A critical review. Mehedi Masud

Abstract: Security is a precondition to development. There can be no human progress without the essence of security-without a secure society. In global politics, national security is central to all sovereign states. Hence, states regularly assess the threat perception and keep vigil on the security arrangements. But this sort of perception can not be wholly applied to the small states of the third world. The third world states are always preoccupied with their own internal problems like fulfilling the fundamental needs. External security is of secondary importance to them. Domestic security is more important to them as sometimes external threats crop up because of mishandling of the domestic ones. The tribal insurgency problem of Bangladesh may be cited as one of the examples. The Indian connection of tribal issue gave it international looks. The issue is now settled with the signing of CHT peace treaty. Therefore we see the notion of security is different in the third world countries. This paper examines the threat perception of Bangladesh, its geostrategic setting, and prescribes for its security arrangement. It also explains the definition of security in the context of the small states.

নিরাপত্তার ধারণাটি মানবেতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন। কেননা এটির সাথে অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িত। নিরাপদে থাকার নামই নিরাপত্তা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিরাপত্তা বিষয়ক ধ্যান ধারণাসমূহ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কাল থেকেই ব্যাপক

---

* মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

পরিসরে আলোচিত হতে থাকে। সাধারণভাবে নিরাপত্তা বলতে আমরা সামরিক নিরাপত্তা বুঝে থাকি। এটি আংশিক সত্য। নিরাপত্তার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা সামরিক নিরাপত্তা হলো নিরাপত্তার একটি অংশ মাত্র। এর অন্যান্য অবিচ্ছেদ্য অংশগুলো কোন ক্রমেই গুরুত্বহীন নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে নিরাপত্তার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট এস, ম্যাকনামারা যথার্থই বলেন "It is increasingly being realised that it is poverty, not the lack of military hardware that is responsible for inscurity across the southern half of the planet" (Mc Namara, 1968 : 149)। অর্থাৎ দারিদ্র্যই হল বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের নিরাপত্তাহীনতার কারণ। নিরাপত্তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বর্তমানে অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য, জাতিগত দাঙ্গা-বিরোধ, কুসংস্কার, অশিক্ষা প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের প্রতি গুরুতর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– (১) নিরাপত্তা ও ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রদান ও (২) নিরাপত্তার নিরিখে তৃতীয় বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান, ঝুঁকি ও করণীয়সমূহ সম্বন্ধে আলোকপাত করা।

ক্ষুদ্রতা ও নিরাপত্তা

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক ১৯৯৮ সনের মে মাসে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে উপমহাদেশে সামরিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। তাই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও নিরাপত্তা–এই দুটো প্রত্যয় সম্বন্ধে আলোকপাত করা দরকার। প্রথমেই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রসঙ্গে আসা যাক। ডেভিড, জে, সিঙ্গার এবং মেলভিন স্মল (১৯৭৩) মনে করেন, প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজধানীতে অবস্থানরত কূটনীতিকদের সংখ্যা এবং তাঁদের শ্রেণীনিরূপিত আন্তর্জাতিক মর্যাদার শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ Interna-

tional Status Ordering এর মাধ্যমে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ও বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণ দ্বারাই বৃহৎ রাষ্ট্র ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের তারতম্য নির্ণয় করা যায়। কেননা রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক সম্পর্ক ও আচরণ অবশ্যম্ভাবীরূপে অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জাতীয় শক্তির (National Power) উপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে রাষ্ট্রসমূহের বাহ্যিক আচরণ ও সম্পর্ক। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র/ক্ষুদ্র শক্তি এবং বৃহৎ রাষ্ট্র/বৃহ শক্তির মধ্যে পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সর্বপ্রথম সামরিক প্রয়োজনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এই বিভাজন রেখা অংকিত হয় নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর ভিয়েনা কংগ্রেসে। ১৮১৪ সনে সম্পাদিত Chaumant চুক্তি অনুযায়ী পুনরায় ফরাসী আক্রমণের আশংকায় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর উপর পরবর্তী বিশ বছর ৬০,০০০ (ষাট হাজার) সৈন্য রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল। যে সমস্ত রাষ্ট্র এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ গ্রহণের সামর্থ্য ছিল সেগুলি বৃহৎ শক্তি/বৃহৎ রাষ্ট্র এবং বাদবাকী সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রূপে চিহ্নিত হয় (Rothstein, 1968)। আধুনিক সমরবিশেষজ্ঞগণের মতে জি এন পি ও সামরিক বাজেটের মাধ্যমেই রাষ্ট্রসমূহের শক্তিমত্তা বা বড়ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব নির্ধারণ করা যায়। অবশ্য ক্ষুদ্র শব্দটি আপেক্ষিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান একটি বৃহৎ শক্তি কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের তুলনায় পাকিস্তান একটি ক্ষুদ্র শক্তি। তাহলে বলা যায় যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে আমরা সেই সব রাষ্ট্রকে বুঝি যার জিএনপি ও সামরিক বাজেট আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক এই উভয়বিদ প্রেক্ষাপটেই ক্ষুদ্র। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান জিএনপি ও সামরিক বাজেট এ দুটো সংখ্যাগত নির্ণায়কের ভিত্তিতে জাতিসমূহের সামগ্রিক শক্তি সূচক অবস্থান নির্ণয় করেছেন। এই নির্ণায়ের ভিত্তিতে নিম্নে ১১টি রাষ্ট্রের মর্যাদাক্রম প্রদত্ত হলঃ

সারণী ১। পরিমাণগত সমর সক্ষমতা অনুযায়ী ১১টি রাষ্ট্রের মর্যাদাক্রম

দেশের নাম	১৯৯৮ সনের মুদ্রামান হিসেবে জি এন পি মার্কিন ডলার (বিলিয়ন)	জি এন পির জন্য স্কোর	** ১৯৯৮ সনের মুদ্রামান হিসেবে সামরিক বাজেট	সামরিক বাজেটের* জন্য স্কোর	মোট	র‍্যাংক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭৯০৩.০	১০০.০০	২৬৩.৩৭ বি	৫০.০০	১৫০.০০	১
জাপান	৪০৮৯.১	৫১.৭৪	৩৭.৮৩ বি	৭.১৮	৫৮.৯২	২
জার্মানী	২১৭৯.৮	২৭.৫৮	৩২.০১ বি	৬.০৭	৩৩.৬৫	৩
ফ্রান্স	১৪৬৫.৪	১৮.৫৪	৩৯.৯৫ বি	৭.৫৮	২৬.১২	৪
যুক্তরাজ্য	১২৬৪.৩	১৫.৯৯	৩৬.৬৪ বি	৬.৯৫	২২.৯৪	৫
ইটালী	১১৫৭.০	১৪.৬৪	২৩.৪৩ বি	৪.৪৪	১৯.০৮	৬
চীন	৯২৩.৬	১১.৬৮	১৮.২২ বি	৩.৪৫	১৫.১৩	৭
ব্রাজিল	৭৬৭.৬	৯.৭১	১০.৮৯ বি	২.০৬	১১.৭৭	৮
কানাডা	৫৮০.৯	৭.৩৫	৭.৫৪ বি	১.৪৩	৮.৭৮	৯
ভারত	৪২৭.৪	৫.৪০	৯.৩ বি	১.৭৬	৭.১৬	১০
রুশ ফেডারেশন	৩৩১.৮	৪.১৯	৮.৮৫ বি	১.৬৮	৫.৮৭	১১

সূত্র ঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন। ইউ, এন, ডি, পি, ২০০০।

* অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বনে। বিস্তারিত পাঠের জন্য দেখুন, তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অধ্যাপক তালুকদার মানিরুজ্জামান পৃঃ ১৩- ১৪।

** সামরিক বাজেটটি জিডিপির শতাংশ হিসেবে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ইউ, এন, ডি, পি, ২০০০-এ প্রদত্ত আছে। সেখানে থেকে গণনা করে সামরিক বাজেট নির্ণয় করা হয়েছে।

এবারে আসা যাক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে। নিরাপত্তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়াল্টার লিপম্যান বলেন, "A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values, if it wished to avoid war and is able, if challenged, to maintain them by such victory in such a war" (Lippman, 1943 : 51)। অর্থাৎ একটি জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মৌলিক মূল্যবোধগুলো বিসর্জন দেবার মতো অবস্থায় পতিত না হয় এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

তৃতীয় বিশ্বের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতে "নিরাপত্তা দ্বারা আমরা যে কোন জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতার মত ন্যূনতম মৌলিক মূল্যবোধগুলো প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ করাকে বুঝে থাকি" (Maniruzzman, 1982)। সুতরাং একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, নিরাপত্তা বলতে শুধু সামরিক নিরাপত্তা বা বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাবার সামর্থ্যকেই বুঝায় না বরং এটা বহুলাংশে অ-সামরিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবিকপক্ষে সংকীর্ণ সামরিক প্রিজম (Prism) এর ভেতর দিয়ে নিরাপত্তার রূপ ও দর্শন অনুধাবন করা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা দ্বারা অ-সামরিক ও অপ্রচলিত/অসনাতন হুমকি থেকে আত্মরক্ষার সামর্থ্যকেও বুঝানো হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, মাদক চোরাচালান, জাতিগত বিরোধ, পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র প্রভৃতি নিরাপত্তার সনাতন ধারণাটিকে আমূলভাবে রূপান্তরিত করেছে। সুতরাং দেখা যায় যে, নিরাপত্তার সামরিক অংশটির গুরুত্ব স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। রবার্ট এস, ম্যাকনামরা এই প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেন, "Security means development. Security is not military hardware though it may include it, security is not military force though it may involve it, security is not traditional military activity, though it may encompass it, security is development and without development there can be no security" (Maniruzzaman, 1982 : 149)। একটি রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নীতি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষা

ছাড়াও রাষ্ট্রটির জন্য এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে যার মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠে। কেননা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অস্থিতিশীলতা প্রায়শঃই বহিঃশত্রু কর্তৃক সৃষ্ট হুমকির চেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই জাতীয় নিরাপত্তা নীতি হল একটি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও সামাজিক চাহিদার সুষম সমন্বয়। সুশাসনের অনুপস্থিতি, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর একটি সাধারণ চিত্র। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে নিরাপত্তার অভ্যন্তরীণ হুমকি তুলনামূলকভাবে বেশী স্পষ্ট- বিশেষতঃ বর্তমান বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায়। এটা হাতাশাজনক যে, অনুন্নত দেশসমূহ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই অভ্যন্তরীণ হুমকি মোকাবেলার জন্য সামরিক চাহিদার শরণাপন্ন হয়। সামরিকশক্তির আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে এই সব তৃতীয় বিশ্বের রাষ্টনায়কগণ ক্ষমতার ভিত পাকাপোক্ত করায় অভিলাষী হয়ে উঠেন। নিম্নের সারণীটি এই ধারণাটিকে আরো স্পষ্ট করবে।

সারণী ২। প্রতিরক্ষা বাজেট

দেশ	প্রতিরক্ষা বাজেট			জিডিপিতে প্রতিরক্ষা বাজেটের শতকরা অংশ		
	১৯৮৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৮৫	১৯৯৬	১৯৯৭
যুক্তরাজ্য	$ ৪৫.৪ বি	$ ৩৫.২৬বি	$ ৩৫.৭৪বি	৫.২	৩.০	২.৮
ফ্রান্স	$ ৪৬.৫ বি	$ ৪৭.৪ বি	$ ৪১.৫ বি	৪.০	৩.৩	৩.০
কানাডা	$ ১১.১৪ বি	$ ৮.৬ বি	$ ৭.৭৫ বি	২.২	১.৪	১.৩
ভারত	$ ৮.৯ বি	$ ১২.০৭ বি	$ ১২.৮ বি	৩.০	৩.৩	৩.৩
পাকিস্তান	$ ২.৯৫ বি	$ ৩.৬৫ বি	$ ৩.৫০ বি	৬.৯	৫.৯	৫.৮
শ্রীলংকা	$ ৩.২৫ মি	$ ৮.৮৭ মি	$ ৮.৯৮ মি	৩.৮	৬.৩	৬.১
বাংলাদেশ	$ ৩৩৬ মি	$ ৫৫৪ মি	$ ৫৯৩ মি	১.৪	১.৭	১.৯

উৎস ঃ দি মিলিটারি ব্যালেন্স ১৯৯৮/৯৯, দি ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর ষ্ট্র্যাটেজিক ষ্টাডিজ। লন্ডন,১৯৯৮।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভাবনা ও ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ ঃ

বাংলাদেশের নিরাপত্তার ঝুঁকির দুইটি উৎস– বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ। পূর্বের আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় ক্ষুদ্রতা ও নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে আমাদের নিরাপত্তা ইস্যুসমূহ প্রধানত আন্তঃসম্পর্কিত। এই কারণে এই নিরাপত্তা ইস্যুসমূহকে নিয়মিতভাবে চিহ্নিত করা, বিশ্লেষণ ও বস্তুগতভাবে সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে হাল নাগাদের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রু বা চিরস্থায়ী মিত্র বলে কোন কথা নেই। কাজেই রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বিনিময়, ঘাত-প্রতিঘাত, কূটনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রভৃতির ভিত্তিতে নিরাপত্তা ইস্যুসমূহেরও পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের নিরাপত্তা মূলত ভারত-কেন্দ্রিক। এটাই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী। সত্যও বটে। ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ হল ভারত বেষ্টিত একটি দেশ। তিন দিকেই রয়েছে ভারতীয় ভূ-খন্ড। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। আর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মায়ানমার হলো ভারত ব্যতীত দ্বিতীয় রাষ্ট্র যার সাথে বাংলাদেশের 'Common Border' রয়েছে এবং এর দৈর্ঘ্য মাত্র ২৮০ কিঃ মিঃ। পক্ষান্তরে ভারতরে সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য হল ৩৭১৫ কিঃ মিঃ। কার্যতঃ ভারতই হল বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিবেশী। বাংলাদেশ একটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হবে যদি কোন কারণে শক্তিশালী ভারতীয় নৌবাহিনী (যার কোন জুড়ি এই অঞ্চলে নেই) বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সরাসরি সংযোগস্থলে অবরোধ স্থাপন করে। পারিভাষিকভাবে এই ধরণের পরিস্থিতিকে "Tyranny of Geography" বলে অভিহিত করা হয়। ভারত-নির্ভরশীলতা সৃষ্টির কারণ বহুবিধ। প্রথমতঃ বাংলাদেশ একটি নদী বহুল দেশ। এই ব-দ্বীপের চুয়ান্নটি (৫৪) নদীর সবগুলিরই উৎপত্তিস্থল বা উৎস হল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হিমালয় পর্বতমালা। উজানের দেশ হিসেবে স্বভাবতঃই ভারত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের ৯২% পানি প্রবাহিত হয় ভারতে হতে। সুতরাং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশকে নির্ভর করতে হয় ভারতের করুণার উপর। এর ফলে সময়ে-অসময়ে অনাবৃষ্টি/খরা, অতিবৃষ্টি/বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশকে। গঙ্গা পানি চুক্তি, ১৯৯৬ এর ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনে বহুদিন ভারত ইন্ধন যুগিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কেননা বাংলাদেশের অতীত সরকারগুলো ছিল ভারত বিরোধী। সেই সময় সরকারের চীন ও পাকিস্তানপন্থী নীতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবেই ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন জিইয়ে রেখেছিল। বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শন্তিচুক্তি, ১৯৯৭ স্বাক্ষরিত হওয়ায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। তৃতীয়তঃ ভারত-বেষ্টিত হওয়ার কারণে স্থল যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশ ভারতের উপর সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের অপর প্রতিবেশী মায়ানমারে বর্তমানে সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন। ইতোমধ্যেই রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু নিয়ে মায়ানমারের দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন বাংলাদেশে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া উভয় দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা এখনও সঠিকরূপে চিহ্নিত না হওয়ায় সমস্যা বিরাজ করছে।

বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থান কিছু সুনির্দিষ্ট কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি ভারতীয় রাজ্যকে (সেভেন সিষ্টারস নামে পরিচিত) অবশিষ্ট ভারত থেকে পৃথক করে রেখেছে। উল্লেখ্য এই সেভেন সিষ্টারস যা North-East Frontier Agency নামেও পরিচিত, একটি রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন কবলিত এলাকা। ভারত সকারের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও এই অঞ্চলে গোলযোগ অব্যাহত রয়েছে। এই কারণেই ভারত সব সময় একটি বন্ধুভাবাপন্ন বাংলাদেশকে পাশে চাইবে। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তার এটাও একটি অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ থেকে চীনের দুরত্ব মাত্র ৯৩ কিঃ মিঃ। একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে চীনের এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ স্বার্থ রয়েছে। সন্দেহ করা হয়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সেভেন সিষ্টারস-এ চীনের উসকানীতেই গোলযোগ অব্যাহত রয়েছে। যদিও একসময় অভিযোগ ছিল যে বাংলাদেশের মদদ রয়েছে বিদ্রোহীদের পিছনে।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ পশ্চিম এশিয়াকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযুক্ত করেছে। অর্থাৎ এই দুই অংশের মধ্যে Geographic Bridge রূপে বাংলাদেশ বিরাজ করছে। এবং চতুর্থতঃ ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের সংযোগ রয়েছে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রতিরক্ষা কৌশলকে দুর্বলতর করেছে। বিশাল জলরাশি বা উঁচু পর্বতশ্রেণীর মত কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক বাংলাদেশে নেই। ফলে যে কোন বৈদেশিক আক্রমণে বাংলাদেশ সহজেই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বিধায় কোন ভূ-খন্ডগত গভীরতা/ বিস্তার (Territoral depth) এর নেই। ফলে প্রলম্বিত যুদ্ধবিগ্রহে (Protracted Warfare) বাংলাদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বিশাল রাষ্ট্র ছিল। এই কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী বাহিনীর কাছে প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরেও শেষ পর্যন্ত নাৎসী বাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে হার মানে। জার্মান বাহিনী রাশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ড জয় করার পরেও যখন দেখে সামনে আরো বিস্তৃত রাশিয়া, রাজধানী মস্কো অনেক দূরে, আর বিখ্যাত রুশ শীতকাল জেঁকে বসেছে তখন অনাহারে যুদ্ধক্লান্ত, শীতক্লিষ্ট জার্মান বাহিনী অনবরত তুষারপাতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে নাৎসী বাহিনী আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে ভূ-খন্ডগত গভীরতা একটি বড় উপাদান সামরিক ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি মূলত দুই প্রকারঃ অভ্যন্তরীণ হুমকি ও বৈদেশিক হুমকি।

ক) অভ্যন্তরীণ হুমকিসমূহ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ হুমকির প্রধানত তিনটি উৎস রয়েছেঃ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাঃ বন্যা, অতিবৃষ্টি/ অনাবৃষ্টি, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়ী ঢল এবং অশিক্ষা, বৈদেশিক সাহায্যের

উপর নির্ভরশীলতা, মৌলবাদ ও জাতি বিরোধ প্রভৃতি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। এগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচনা করা হলঃ

(১) আর্থ সামাজিক হুমকি

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ইউ. এন. ডি. পি (UNDP) এর প্রতিবেদন, ২০০০ অনুযায়ী বিশ্বে মানব উন্নয়নসূচকে বাংলাদেশের স্থান ১৪৬তম এবং বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৫০ ইউ. এস. ডলার। বাংলাদেশের আয়তন মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১২ কোটি ৭০ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে পরিবর্তন না ঘটলে আগামী ২০২৫ সন নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হবে। কাজেই আমাদের জনসংখ্যার চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশের দরিদ্র অর্থনীতির জন্য এই বিপুল জনসংখ্যা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দারিদ্র্য পীড়িত জনগণ কখনোই দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আশানুরূপ অবদান রাখতে পারে না। বরং দারিদ্র্য দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। ভঙ্গুর অর্থনীতি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র এই অরাজতকার সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাঁদের কায়েমী স্বার্থ চাপিয়ে দেয়। দেশের স্বাধীনতা হয়ে পড়ে বিপন্ন। এই প্রসঙ্গে শ্রীলংকার তামিল সমস্যাকে আমরা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। শ্রীলংকার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে বর্তমান পর্যায়ে আনার কৃতিত্ব কিছুটা হলেও প্রতিবেশী সরকারকে স্বীকার করতে হবে।

সামাজিক অবক্ষয় ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শিক্ষিত বেকার যুবগোষ্ঠী বিপথগামী হয়ে পড়ছে অভাবের তাড়নায়। এরা সহজেই বিদেশী সেবাদাসদের ক্রীড়ণকে পরিণত হতে পারে। অর্থের বিনিময়ে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা এদের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।

(২) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাজনিক হুমকি

স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের সূচনা লগ্ন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে দেশটি জটিল

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়। ঘন-ঘন ক্ষমতা বদল, সামরিক সরকারের দমন-পীড়ন প্রভৃতি পেরিয়ে বাংলাদেশে এখন মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। পর পর দুটি গণতান্ত্রিক সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

সরকারকে এখন এই বিষয়টি ভাবতে হবে যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কার ও ঢালাও উদারীকরণনীতি দেশের উন্নতির একমাত্র ফর্মুলা নয়; বরং এগুলো নিশ্চিত করার জন্য দরকার সুশাসন জবাবদিহিতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। মৌলিক চাহিদা, ন্যূনতম নাগরিক অধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা প্রভৃতি পরিপূরণে সরকার ব্যর্থ হলে জনগণের প্রত্যাশা উপেক্ষিত হবে। পরিণামে আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে। পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে, দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উভয়েই এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে নিহত হন। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে সামরিক শাসক হোসেন মোঃ এরশাদও জনতার আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করে পদত্যাগে বাধ্য হন। আমরা জানি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ঘন-ঘন সরকার পরিবর্তন ঘটে যেটা দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলো তাঁদের মনোনীত পুতুল সরকার চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়ে যায় এর ফলে। বাংলাদেশের মূল জাতীয় ইস্যুগুলির ব্যাপারে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মতদ্বৈততার ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সাধারণত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। জাতীয়তাবাদ, জাতীয় উন্নয়ন কৌশল, মৌলবাদী রাজনীতি তথা জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় বিষয়াদির অপপ্রয়োগ বা ধর্মের স্থান ইত্যাদি ব্যাপারে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করায় বিরোধ প্রবলতর হয়ে উঠছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সাধারণত অর্থনৈতিক অনগ্রসতার কারণে সৃষ্ট হয়। অর্থনীতি ও রাজনীতি পরস্পর সংযুক্ত একটি অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটো প্রতিনিয়ত একে অপরকে প্রভাবিত করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হলে দেশের পরিস্থিতি ভারসাম্যহীন হবে। আবার রাজনৈতিক অঙ্গন কোন কারণে উত্তপ্ত হলে

অর্থনৈতিক অগ্রগতিও ব্যহত হবে। ক্ষমতাসীন এলিটগোষ্ঠী কায়েমী স্বার্থ প্রলম্বিত করার জন্য তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বেনিফিশিয়ারী করে থাকেন। বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ফলে ক্ষুব্ধ হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল এই পর্যায়ে ইন্ধনদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। রাজপথ শ্লোগানে মুখরিত হতে থাকে। এভাবেই সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সরকারের প্রাইভেটাইজেশন নীতির পক্ষে-বিপক্ষে ইতোমধ্যেই এ ধরণের ঘটনা ঘটে গেছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আরেকটি কারণ হল আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর কোন সুনির্দিষ্ট কোড অফ কনডাক্ট নেই। খোদ জাতীয় সংসদের ভিতরে বসেই সাংসদগণ একে অপরের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য ছুড়ে দেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথার্থ অর্থে শক্তিশালী না হওয়ায় বুনিয়াদি কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে। গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় এই ঘাটতিগুলো কাটিয়ে উঠা যাবে।

(৩) উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১% হল বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী। এর মধ্যে চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, মুরং, খাসিয়া, গারো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব জাতি-গোষ্ঠী উপজাতি নামে সমধিক পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৩টি জাতি-সত্তা বসবাস করে। তন্মধ্যে চাকমা গোষ্ঠী মোট পার্বত্য উপজাতির প্রায় ৫০% গঠন করে। উল্লেখ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আয়তন দেশের মোট ভূমির শতকরা ১০ ভাগ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন শুরু হয় স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭৩ সনে। চাকমা সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদানের দাবী জানিয়ে আসছিল। পরবর্তিতে তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে একটি সশস্ত্রবাহিনী ছিল। এই বাহিনী শান্তিবাহিনী নামে পরিচিত। এই শান্তিবাহিনী গত ২৩ বছর দেশের শান্তি সার্বভৌমত্বের প্রতি একটি হুমকি স্বরূপ বিরাজ করছিল। অবশেষে ১৯৯৭ সনের ডিসেম্বর মাসে সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাহাড়ের পরিস্থিতি এখন শান্ত। কিন্তু সম্প্রতি শান্তি চুক্তি বিরোধী পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ে আবার অসন্তোষের ধূম্রজাল বিস্তার করতে চাইছে। তারা মাঝে মধ্যেই প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের অপহরণ করে মুক্তিপণ চাইছে। অধিকন্তু, শান্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতা সন্তু লারমা শান্তি চুক্তি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা বলে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন। গত ০৪-০১-২০০১ সন্তু লারমা প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ শেষে অভিযোগ করেন "চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে। বাস্তবায়নে কোন মৌলিক অগ্রগতি আমরা দেখতে পাচ্ছিনা" (সূত্র ঃ ইউ, এন, বি, ০৫-০১-২০০১)। অর্থাৎ অসন্তোষ আবার দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সরকারকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।

(৪) পরিবেশ দূষণ

মেক্সিকো সিটি কিছুকাল পূর্বেও পৃথিবীর দূষিত শহরগুলির তালিকাটিতে শীর্ষতম স্থান অধিকর করে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঢাকা মহানগরী পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে মেক্সিকো সিটিকে টপকে প্রথম স্থানটি দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশের পরিবেশগত চিত্র মোটেই ভাল নয়। বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, ব্যাপকহারে বনোজাড়, যত্রতত্র বৃক্ষনিধন, গাড়ীর কালো ধোঁয়া প্রভৃতি ক্রমাগত হারে পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। অতিবৃষ্টি/অনাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি পরিবেশ অব্যবস্থাপনারই ফলাফল। এছাড়া বছরওয়ারী বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলে পাহাড়ী ঢল ও পাহাড় ধসের ফলে যথেষ্ট সংখ্যক জানমালের ক্ষতি হয়ে থাকে। এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের অবকাঠামো সুবিধাদি ধ্বংস হয়, মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট হয় সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সনের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক চিত্র তুলে ধরলেই বুঝা যাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা পরিবেশ দূষণের ফলাফল, দেশের নিরাপত্তার জন্য কত বড় হুমকি স্বরূপ। ১৯৮৮ সনের বন্যায় দেশের তিন চতুর্থাংশ ভূমি তলিয়ে যায় যার পরিমাণ ৮৯,৯৭০ বর্গ কিঃ মিঃ। ১৯৯৮ সালের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

সারণী ৩। বন্যা ১৯৯৮

ক্ষতিগ্রস্ত জেলার সংখ্যা	৫২	ক্ষতিগ্রস্ত থানার সংখ্যা	৩৬৬	ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	৩৩২৩
ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি	১৪২৩৩২০ একর	ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা	৯৮০৫৭১	মৃতলোকের সংখ্যা	৯১৮ জন
মৃত গবাদি পশুর সংখ্যা	২৬৫৬৪	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা	১৫৯২৭ কিঃ মিঃ	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ	৪৫২৮ কিঃ মিঃ
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭১৮	ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ, কালভার্ট	৬৮৯০	ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা	৩০৯১৬৩৫১

সূত্র ঃ ইমারজেন্সী অপারেশন সেন্টার ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮।

উপরের সারণী থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, একেকটি প্রলয়ংকরী বন্যা দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়াত্বের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। এল নিনো ও লা নিনার প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে বারংবার পতিত হচ্ছে। পরিবেশের সুষ্ঠু সংরক্ষণের প্রভাবে এগুলো অতীতের চেয়ে বেশী মাত্রায় হচ্ছে। এছাড়া নির্বিচারে বনোজাড়, মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলায় কোন বনাঞ্চল নেই। একটি দেশে যেখানে Ecological ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক সেখানে বাংলাদেশের রয়েছে শতকরা ৬-৮ ভাগ বনাঞ্চল। কীটনাশকের বিষাক্ত প্রভাব বায়ু, পানি, উদ্ভিদ, প্রাণীসহ সামগ্রিকভাবে খাদ্যচক্রে প্রবেশের মাধ্যমে Life Support System ভেঙ্গে যায়। ফলে জীবন চক্র হুমকির সম্মুখীন হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কীটনাশকসহ নাইট্রোজেন, ইউরিয়া ও ফসফরাস সমৃদ্ধ কৃত্রিম সারের অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দূষিত হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় এদেশে মানুষের দেহে ১৩-৩১ পিপিএম ডিডিটি

পাওয়া যায় যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের, জার্মানী ও যুক্তরাজ্যে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৫.২, ২.৩ ও ২.২ পিপিএম (হোসেন ও ইমাম, ১৯৯৮)। এছাড়া বিশ্বব্যাপী উষ্ণতাবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের ১১.৪% ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে যদি সমুদ্রের উচ্চতা ৩ ফুট বেড়ে যায় (Wirth, 1989)। সুতরাং পরিবেশ দূষণ যথাযথভাবে সম্বোধিত না হলে দেশের ভবিষ্যত হুমকির সম্মুখীন হবে।

খ) বৈদেশিক হুমকিসমূহ

(১) বৈদেশিক সাহায্যের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা

তথ্য মহাসারণী, বিশ্বায়ন, বহুজাতিক কোম্পানীগুলির তৎপরতা প্রভৃতি বিশ্বঅর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করলেও তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশকে ক্রমবর্ধমান হারে দাতাদেশ/সংস্থাসমূহের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। আর স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের ঋণের পরিমাণ বেড়ে ১৮০০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০)।

একথা সত্য যে, উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহীতা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সেটা অভ্যন্তরীণ হোক আর বৈদেশিক হোক দাতা দেশসমূহ সবসময় নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের শর্তগ্রহীতা রাষ্ট্রসমূহের উপর চাপিয়ে দেয়। সম্প্রতি সায়দাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক হস্তক্ষেপ করে ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি ছুড়ে দেয় এই বলে যে, তাদের নির্ধারিত শর্ত না মানা হলে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে অর্থায়ন করা হবে না।

(২) রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা

রোহিঙ্গা সমস্যা আজো বাংলাদেশের মাথা ব্যথার কারণ। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী এখনও বাংলাদেশে অবস্থান করছে। ১৯৭৮ সনে সর্বপ্রথম

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৯৭৯ সনে এক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে এই সব শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৯৯২ সনে পুনরায় রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তিন লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী এই সময় বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাই কমিশনের তৎপরতায় দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় সিংহভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসিত হয়। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী অদ্যাবধি প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় রয়েছে।

রোহিঙ্গা মায়ানমারের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। তাঁরা আরাকানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও সরকারের নিপীড়ন নির্যাতনের মাত্রা তাঁদের উপর বেশী এই কারণে যে রোহিঙ্গারা নাকি মায়ানমারের আদি জনগোষ্ঠী নয়। কেননা তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনে অযথা কালক্ষেপণ করায় মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। মায়ানমারে বর্তমানে একটি সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন। ১৯৭৮ ও ১৯৯২ এর পুনরাবৃত্তি যে এই সামরিক সরকার ঘটাবে না এর কোন নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ সরকারের এই ব্যাপারে আরো সতর্ক ও পর্যবেক্ষণশীল হতে হবে।

(৩) মাদক চোরাচালান

গোল্ডেন ট্রায়াংগল (লাওস, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড), গোল্ডেন ওয়েজ এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তান) এই এলাকা তিনটি ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের সন্নিহিত হওয়ায় মাদক চোরাচালানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি আদর্শ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সুতরাং ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ একটি বিপদাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। মাদক বিক্রয়/সেবন ও চোরাচালান ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

(৪) আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা

ভারত ও পাকিস্থান কর্তৃক ১৯৯৮ সনে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। একটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই ঘটনা পরম্পরার প্রভাব থেকে বিযুক্ত হতে পারে না। বরং Nuclearized দক্ষিণ এশিয়ার একটি অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তাও এতে বিঘ্নিত হয়েছে। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর পরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ প্রতিধ্বনিত হয়েছে গত ১৯৯৮ সনের ৩রা জুন যখন তিনি বান্দরবন ক্যান্টনমেন্টে জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। এই বক্তব্যে তিনি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে পরিবর্তন আনয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। কেননা ইন্দো-পাক সম্পর্কের বৈরিতা অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশী প্রাচীন। এ যাবত দুটি দেশের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে। চতুর্থ যুদ্ধটি যে আণবিক যুদ্ধ হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভারত ১৯৭৪ সনে আণবিক বোমার অধিকারী হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনের ১১ ও ১৩ই মে অকস্মাৎ রাষ্ট্রটি আবার আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৯৮ সনের ২৮শে ও ৩০শে মে পাকিস্থানও 'Retaliatory Nuclear Detonation' এর মাধ্যমে আণবিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যে কোন ক্রিয়া/শক্তির একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া আাছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর পরই একই পথ অনুসরণ করে তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও গণচীন।

জন্মলগ্ন থেকেই ভারত ও পাকিস্থান একে অপরের চরম শত্রু। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে প্রায় দশ লক্ষ লোক হতাহত হয় এবং আরো এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক সীমান্ত বদল করে। কাজেই আণবিক শক্তির অধিকারী এই দুই শত্রুদেশের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। 'Accidental Nuclear Holocaust' এর ব্যাপারটিও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা আণবিক প্ল্যান্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুরূহ, সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার উপর অভ্রান্ত দখল অদ্যাবধি এই দুটো দেশ আয়ত্ত্ব করতে পারেনি। ফলে দুর্ঘটনাক্রমে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঝুঁকি রয়ে গেল। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য পরমাণুযুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চরম নিরাপত্তা বিরাজ করছে। কেননা অকস্মাৎ কোন অ-বিশ্বস্ত অঙ্গুলীহেলনে পুরো

চিত্রপট বদলে যেতে পারে। Command and Control ব্যবস্থা ও Fail safe mechanism দুর্ঘটনামূলক আণবিক বিস্ফোরণ এড়ানোর চাবিকাঠি। আতংকজনক হলেও এই ব্যবস্থা ভারত বা পাকিস্থান কোন রাষ্ট্রেরই নেই। কারো অসাবধানতা বশত যদি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটে তবে Nuclear Fallout এর ভয়াবহতা থেকে এই অঞ্চলের কোন রাষ্ট্রই পরিত্রাণ পাবে না। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার বিষবাষ্প পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে যাবে।

ভারতে বর্তমানে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ১৯৬৪ সনে যখন চীন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় তখন মিঃ অটল বিহারী বাজপেয়ী, যিনি ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী,পার্লামেন্টে ক্রোধভরে বলেছিলেন "The answer to an atom bomb is an atom bomb nothing else" (নিউজউইক, অক্টোবর ১৯, ১৯৯৮, পৃঃ ১৩০)। মিঃ অটলবিহারী বাজপেয়ী এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। আর পাকিস্থানেও বর্তমানে একটি সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়া একটি নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি একথা বলাই বাহুল্য। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ইতোমধ্যেই পুরোনো দিনের ইতিকথায় রূপান্তরিত হওয়ার পথে।

(৫) অস্ত্র চোরাচালান

আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালানীদের জন্য ভারত ও মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি আশীর্বাদ স্বরূপ। এদের কাছে কোটি কোটি টাকার অস্ত্রের চালান পৌঁছে যায় বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। আসামের উলফা গেরিলারা অস্ত্র সাহায্য প্রায় বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে এ অভিযোগ ভারত বহু আগে থেকেই করে আসছে। মায়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপগুলো অস্ত্রের চালান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে থাকে। সন্দেহ করা হয় বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে এসব অস্ত্রের চালান খালাস হয়। ট্রলার যোগে এই সব অস্ত্রের চালান পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই ব্যাপার সরকারকে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

(৬) অমিমাংসিত ম্যারিটাইম (Maritime) ইস্যুসমূহ

বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমারের Maritime boundary এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি। সংলাপের ভিত্তিতে এই ইস্যুর সমাধান সম্ভব হয়নি দেশগুলোর স্ব স্ব জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক সমুদ্র আইনের ব্যাখ্যার কারণে। Maritime area-র উপর রাষ্ট্রসমূহের বিরোধপূর্ণ অবস্থানের কারণে সমুদ্র ও সমুদ্রতলের অফুরন্ত সম্পদরাজি থেকে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। উপরন্তু, সম্পদ-বঞ্চিত এই দেশটির সমুদ্র সীমায় প্রায়শই বিদেশী দস্যু নৌযানসমূহ হানা দিয়ে অবৈধভাবে কোটি টাকার মৎস্য সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অবিলম্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের নীতি অবস্থান ও করণীয়সমূহ

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রধানত দুই প্রকার–অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে অভ্যন্তরীণ হুমকিই বেশী গুরুত্ব বহন করে। সময়োচিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এইসব হুমকি মোকাবেলা করতে হবে। এই ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। এটা একটি ইতিবাচক দিক। ১৯৮২ সালে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এই সচেতনতার প্রমাণ। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলেন পদাধিকার বলে দেশের প্রেসিডেন্ট। এই কাউন্সিল নিয়মিতভাবে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারকে উপদেশনা ও সাহায্য প্রদান করে থাকে। বেসরকারী পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে, এনজিওসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উৎসাহী। সামরিক নিরাপত্তার বিষয়টি এন জিওগুলোর কাছে কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কেননা তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিশাল সামরিক বাজেটকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নই হল নিরাপত্তার ভিত্তি। নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য উপযোগী কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দেশটিকে পূর্বাহ্নেই তার জাতীয় শক্তি ও লক্ষ্যসমূহ নিরূপণ করতে হবে। সি, আই, এ (CIA)-র সাবেক উপ-পরিচালক Dr. Ray S. Cline জাতীয় শক্তি নিরূপণের জন্য নিম্নরূপ একটি ফর্মূলা প্রদান করেছে (Islam, 2000) ঃ

PP = (C+E+M) ×S+W

এখানে,

PP	=	Perceived National Power
C	=	Critical Mass
(C	=	Population + Territory)
E	=	Economic Power
M	=	Military Power
S	=	Strategic Objectives of the Nation
W	=	Will Power of the Nation

একটি দেশের ক্রিটিক্যাল মাস, অর্থনৈতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তিকে দেশটির কৌশলগত লক্ষ্য ও ইচ্ছা শক্তি দ্বারা গুণনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই হল জাতীয় শক্তি। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, জাতীয় শক্তির দুই প্রকার উপাদান রয়েছে- Tangible elements of national power আর Intangible elements of national power। ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, আবহওয়া, প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদ, কাঁচামাল, মানবসম্পদ প্রভৃতি সবই হল জাতীয় শক্তির Tangible উপাদান। পক্ষান্তরে সাংগঠনিক ক্ষমতা, নেতৃত্বের গুণাবলী, সরকার পদ্ধতি, সামাজিক স্তর বিন্যাস, নীতিবোধ, জনগণের ঐক্য প্রভৃতি হল Intangible উপাদান। পরিবর্তিত বিশ্ব পেক্ষাপট ও জাতীয় শক্তির নিরিখে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করবে বলে আশা করা যায়।

প্রথমতঃ একটি সুসমন্বিত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোই বেশী প্রাধান্য পাবে। আর্থ-সামাজিক খাতে কোন রকম বৈষম্য ও বিশৃংখলা দেখার সাথে সাথে তা নির্মূলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সব ষড়যন্ত্র উৎখাতের ব্যাপারে সরকারকে সাহসী ও সদাসতর্ক হতে হবে। কারণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেশের নিরাপত্তার জন্য একটি প্রবল হুমকি।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা চীনের ছাত্র আন্দোলনের কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৮৯ সনে ভিয়েনআনমেন স্কোয়ারে বিশাল ছাত্র বিক্ষোভ সমগ্র চীনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ কূটনৈতিক দক্ষতাকে বাংলাদেশ নিজ নিরাপত্তা সংরক্ষণে একটি ফলপ্রসূ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ জন্য দরকার বিশ্বমানের কূটনৈতিক দক্ষতা। সরকারকে এ ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। কেননা আমাদের দরকার নিবেদিতপ্রাণ ও দক্ষ একদল কূটনীতিক। বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিকনীতির মূল প্রতিপাদ্য হল আক্রমণ নয় বরং আত্মরক্ষা। এ জন্য দরকার বৈদেশিক নীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োগ। সিঙ্গাপুরের দূরদর্শী নেতা লি কুয়ান ইউ এর মধ্যে আমরা এ ধরণের দৃষ্টান্ত পাই। আমরা জানি সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ হলো চীনা বংশোদ্ভূত। এই চীনা জনগণের কারণেই সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল মালয়েশীয় ফেডারেশন থেকে। এই চীনা বংশোদ্ভূত গোষ্ঠী গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘৃণার পাত্র। লী কুয়ান ইউ এটা ক্রমাগতভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "যদি তোমরা চীনা শোভিনিষ্টিক সমাজ চাও, তবে ব্যর্থতা নিশ্চিত। এতে সিঙ্গাপুর অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এমনকি যদি তোমারা বিচ্ছিন্ন নাও হও তবে তোমরা তোমাদের শোভিনিষ্টিক প্রভাব প্রতিবেশী (মালয়েশিয়া)-র দিকে প্রসারিত কর, তবে অন্য কোন বিকল্প না পেলে তারা তোমাদের সঙ্গে বোঝাপোড়া করতে আরেক বৃহৎ প্রতিবেশী (ইন্দোনেশিয়া)-র সঙ্গে এক হবে" (Morrison, 1978)।

লী কুয়ান সর্বদাই সংখ্যা সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুরে একটি বহুজাতিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। চীনা প্রধান সমাজের প্রতিফলন সিঙ্গাপুরে যেন না পড়ে এই বিষয়ে লি-র সতর্ক দৃষ্টি ছিল। লি-র কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ছিল থাইল্যান্ডে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি দীর্ঘায়িত করা। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তা নিহিত আছে থাই সীমান্তে। থাইল্যান্ড থেকে মার্কিন সৈন্যদলের প্রত্যাহারের পর সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। লী তখন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ১৯৭১ সনের নভেম্বরে পঞ্চশক্তি প্রতিরক্ষা

চুক্তিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার নিরাপত্তার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তা সংযুক্ত করেন। লি কুয়ানের কূটনৈতিক দক্ষতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এমনকি কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারেও তাঁর দ্বিধা ছিল। শুধুমাত্র মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দানের পরই তিনি স্বীকৃতি দান করেন। অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কমরেডশীপ গড়ে তোলা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নন-চাইনীজ প্রধান রাষ্ট্রসমূহের খাঁটি সদস্য হবার ব্যাপারে সিঙ্গাপুরের অবিরাম প্রচেষ্টা চিল। কেননা এতে দেশটির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। দক্ষ কূটনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছিল।

বাংলাদেশকেও প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী কূটনীতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা জানি আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই উচ্চমানসম্পন্ন কূটনৈতিক গড়ে তুলতে হবে। সামরিক ব্যয় কমিয়ে কূটনৈতিক খাতে অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে এই লক্ষ্যে। অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেনঃ "ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন রাষ্ট্রের জন্যই এটা সত্য যে আন্তর্জাতিক সংঘাতের প্রশ্নে কূটনীতি হচ্ছে প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন" (Morrison, 1978 : 33)। কাজেই সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচন সম্ভব। Friendship to all, malice to none এই নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক চলে আসছে। সুতরাং কূটনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না।

তৃতীয়তঃ নিরপেক্ষতা বজায়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদারকরণ। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ মর্যাদা অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ যদিও জাতীয় নিরাপত্তার কৌশল হিসেবে তা কার্যকরী। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে হলে কোন রাষ্ট্রকে বেশ কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমতঃ দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ এড়িয়ে চলার ঐতিহ্য থাকতে হবে ও ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এই সংক্রান্ত যথোপযুক্ত নীতিগ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে নিরপেক্ষতার প্রচার কার্য চালাতে হবে যেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট এর

বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা পায়। দ্বিতীয়তঃ ভৌগোলিক অখন্ডতা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী সামরিকবাহিনী থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রটির ভৌগোলিক অবস্থান যেন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়। কেননা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাষ্ট্র যদি নিরপেক্ষ হয় তাহলে তা বৃহৎশক্তিগুলোর কাছে অপরিহার্য বিবেচিত হবে। চতুর্থতঃ রাষ্ট্রটির একটি স্থিতিশীল সমাজ থাকতে হবে যারা নিরপেক্ষতার জন্য অবদান রাখতে সক্ষম। সুইজারল্যান্ড এভাবেই নিরপেক্ষ মর্যাদা লাভ করেছে ১৮১৫ সনে ভিয়েনাচুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স, অষ্টিয়া, গ্রেট বৃটেন, এশিয়া, পর্তুগাল ও রাশিয়া চিরস্থায়ীভাবে সুইজারল্যান্ডের নিরপেক্ষতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতা স্বীকার করে নেয়। একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বহুবিধ সুবিধা ভোগ করে থাকে। প্রথমত ঃ কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই সামরিক ব্যয় থাকে একেবারে ন্যূনতম। দ্বিতীয়তঃ সামরিক ব্যয় ন্যূনতম হওয়ার কারণে আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশী থাকে। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ অর্থনীতির অধিকারী। তৃতীয়তঃ নিরপেক্ষ দেশগুলিকে কোন সামরিক জোটের সদস্য হতে হয় না। কাজেই জোটের কোন সৈন্যদলের ব্যয়বার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বহন করতে হয় না। এই প্রসঙ্গে জামাল আব্দুল নাসেরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, একটা বৃহৎ শক্তি এবং ক্ষুদ্রশক্তির মধ্যে জোট হলো নেকড়ে ও ভেড়ার মধ্যে জোট এবং নেকড়ে কর্তৃক ভেড়াকে গোগ্রাসে গিলে ফেলার মাধ্যমেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং এটা মোটামুটি স্পষ্ট যে, সামরিক জোট বদ্ধ হওয়ার তুলনায় নিরপেক্ষ মর্যাদা লাভ একটি দেশের নিরাপত্তা কৌশলে অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে।

চতুর্থতঃ সিটিজেন্স আর্মী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সিটিজেনস আর্মী নিরাপত্তা ব্যবস্থার এমন একটি কৌশল যেখানে শারীরিকভাবে সক্ষম সকল পুরুষ ও মহিলাদের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ থাকবে। তাই ক্লজভিটজ (Clausewitz) এর ভাষায় বলা চলে, জাতিকে সশস্ত্র করে তোলা হল প্রতিরক্ষার একটা বড় মাধ্যম যা প্রতিরোধের হাজারো উৎসকে জাগ্রত করে অন্যথায় সেগুলো সুপ্তই থেকে যেত (Quoted in Svcies, 1970

: 4)। আমরা জানি, ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহ শুধুমাত্র আক্রান্ত হলেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্ররাষ্ট্র জয়ের জন্য যুদ্ধ করে না বরং আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ যুদ্ধে বিশ্বাসী। আর এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সিটিজেন্স বাহিনী কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ভিয়েতনাম এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তিকে ভিয়েতনামী প্রতিরোধে মুখে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ফিনজাতি শতদিনব্যাপী যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধ করে সম্পূর্ণ এককভাবে। এটা সম্ভব হয়েছে সমগ্র ফিনজাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে।

একটি দেশের ভূ-খন্ড দখল করার অর্থ এই নয় যে দেশটিকে জয় করা, বরঞ্চ যুদ্ধের সূত্রপাত হল এখানেই। অধিকৃত দেশটির উপর পূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনই হলো পুরোপুরি বিজয়। কিন্তু যে দেশের জনগণ হানাদার বিদেশী বাহিনীর অনুগত্য অস্বীকারে রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত সে দেশ দখলের অর্থ হল পাগলা ঘোড়াকে বশ মানানোর মতই বৃথা প্রচেষ্টা। কেননা স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রতিরোধ বা সিটিজেনস আর্মীর প্রতিরোধ মানে গোটা জাতির প্রতিরোধ। ফলে যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়। হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়তে থাকে। চীনে মাওয়ের জনযুদ্ধ, আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়াপের বিজয় প্রভৃতি সিটিজেন্স আর্মীরাই সমার্থক। তাই বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে সিটিজেন্স আর্মী গড়ে তোলার ব্যাপারটি বর্তমান উপমহাদেশীয় পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনার দাবী রাখে। বাংলাদেশর সেনাবাহিনী আকারে ক্ষুদ্র। সিটিজেন্স আর্মী এই সনাতন সেনাবাহিনীর জন্য উপযুক্ত সম্পূরক হতে পারে।

পঞ্চমতঃ বাংলাদেশকে বর্তমানে এই বাস্তবতার আলোকে নিরাপত্তা কৌশল বিশ্লেষণ করতে হবে যে, পরমাণু শক্তির অধিকারী দুটি দেশ তার প্রতিবেশী। উপরন্তু, দুইটি বৈরী দেশ পরমাণু শক্তির অধিকারী হওয়ায় এতদঞ্চলের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। এমতাবস্থায় দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য পরমাণুমুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাপক আকারে পরমাণু বিরোধী প্রচার কার্য চালাতে পারে জনমত গঠনের জন্য। এই প্রচার কার্যের উদ্দেশ্য হবে পরমাণু অস্ত্রের ভয়াবহতা সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা। এন জি ও গুলো এই

ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৯৮৩ সনে ইউরোপে অনুষ্ঠিত শান্তি আন্দোলন থেকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো শিক্ষা নিতে পারে।

ষষ্ঠতঃ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে Confidence Building Measures (CBM) গ্রহণ করতে পারে। ইতোমধ্যেই ভারত ও পাকিস্থান নিজেদের মধ্যে হট লাইন স্থাপন করেছে। কিন্তু No-First-use চুক্তি এখন পর্যন্ত কোন দেশই স্বাক্ষর করেনি। সামরিক শুভেচ্ছা সফর, পাক-ভারত উভয়দেশেই সেমিনার আয়োজন, পারস্পরিকভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন, প্রচলিত অস্ত্রের মজুত কমিয়ে ফেলা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে বাংলাদেশ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে।

সপ্তমতঃ পরবর্তী সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে পারমাণবিক বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে। যেহেতু বিরোধপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক কোন ইস্যু সার্ক ফোরামে আলোচিত হতে পারেনা সেহেতু আঞ্চলিক উদ্বেগের বিষয় হিসেবে পরমাণু ইস্যুটিকে আলোচনার টেবিলে আনা যেতে পারে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

আমরা জানি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরাপত্তার জন্য বেশী হুমকি সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এর জন্য বেশী দায়ী। অত্যধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি সমস্যায় বাংলাদেশ জর্জরিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য প্রকারান্তরে দেশের দারিদ্র্যকে আরো ঘনীভূত করছে। শর্তযুক্ত এই সব বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ অর্থ ফেরত যায় আবার দাতা দেশসমূহে। পরিবহন খরচ, উচ্চহারে কনসালট্যান্সী ফি ইত্যাদি নানা খাতে অর্থ ব্যয়িত হওয়ার পর দেখা যায় মোট অর্থের খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে উন্নয়ন খাতের জন্য। উল্লেখ্য, পরিবহন/জাহাজীকরণ, কনসালট্যান্ট নিয়োগ প্রভৃতি দাতা দেশই নির্ধারণ করে দেয়। প্রায় সবক্ষেত্রেই কনসালট্যান্ট দাতা দেশের নাগরিক হয়ে থাকেন।

আর্থিক দুর্নীতি বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা। এর ফলে দেশের অগ্রগতি/উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ইউ এনডিপি প্রধান গুস্তাভ স্পেথ

সফল উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে ক্যান্সার হিসেবে বর্ণনা করেন (সূত্র ঃ ১০ই আগষ্ট, ১৯৯৭ দৈনিক ইত্তেফাক)। দুর্নীতি দমনের জন্য দরকার সুশাসন। ইউ এন ডি পি ১৯৯৭ সনে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের একটি তহবিল গঠন করেছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

উপসংহার

বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত দ্বারা বেষ্টিত (India-locked) বাংলাদেশ একটি ছোট রাষ্ট্র। সুইডেনের খ্যাতনামা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের অধিকারী রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার সমস্যা কুশলতার সাথে বর্ণনা করেছেনঃ "The rim stateds problem is like the problem of 'Pilot fish' : how to keep close to the shark without being eaten" (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৫)।

বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের নিরাপত্তা কৌশল বেশী কার্যকরী সে বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত অবিলম্বে গঠন করা উচিত। দেশের শীর্ষস্থানীয় আমলা, বুদ্ধিজীবী সকলকেই এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বৈঠক/সংলাপ প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে এটা সম্ভব। সনাতন ও অসনাতন–নিরাপত্তার এই উভয়বিধ দৃষ্টিভঙ্গি এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। নচেৎ একটি সুষম নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন সম্ভব হবে না। উন্নয়নের ভিত্তিতে আত্মরক্ষা এটাই হওয়া উচিত বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মূল বিষয়। কেননা আক্রমণ নয় আত্মরক্ষাই হল আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান কৌশল। জাপান, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশকে আমরা এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি। সংবিধান মোতাবেক জাপানে মোট জি. ডি. পি-র মাত্র ১% সামরিক খাতে ব্যায়িত হয়। এর বেশী নয়। জাপানের জি. ডি. পি-র আকার বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম। কাজেই জাপানের জি.ডি.প-র ১% হল ৩৭.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিশ্বের অনেক দেশের সামরিক ব্যয়কে অতিক্রম করে গেছে। এই প্রবন্ধের পূর্বভাগে আমরা দেখেছি জাপান বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় শক্তিধর দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত শক্তি জাপানের এই উত্থানের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল জাপানী জনগণের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব। যুদ্ধোত্তরকালে

জাপানী জনগণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। ফলে দেশে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উত্থান ঘটে। জাপানের এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই হলো সামরিক শক্তির ভিত্তি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। কেননা আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক শক্তিই হলো সামরিক শক্তির উৎস।

তথ্য নির্দেশিকা

Cluade Jr. Ins L. (1966) 'Preventive Diplomacy' in Lawrence W. Martin (ed.) *Diplomacy in Modern European History.* New York : The Macmillan Company.

GOB (1998) Emergency Operation Center : M/O Disaster Management and Relief.

Holst, Johan Jargon (ed.) (1973) Five Roads to Nordic Security. Oslo : Universities forlaget.

Islam, ABU Azizul (2000) South Asian Nuclear Syndrome : Implication and Policy Options for Bangladesh. *Bangladesh Army Journal.* Dhaka.

Kodikara, Selenton (1979) *Strategic Factors in Interstate Relations in South Asia.* ANU Canberra : Strategic and Defence Studies Centre.

Lippman, Walter (1943) *U. S. Foreign Policy : Shield of the Republic.* Boston : Brown & Co.

Maniruzzaman, Talukdar (1982) *The security of small states in the third world.* The Strategic and Defence Studies Centre : Australian National University.

McNamara, S Robert (1968) *The Essence of Security.* New York : Harper and Row.

Morison, Charles E. and Suhrke, Astri (1978) *Strategies of Survival : The Foreign Policy Dilemmas of Smaller Asian States.* St. Lucia : University of Queensland Press.

Pettman, Ralph (1976) *Smaller Power Politics & International Relations in South East Asia.* Sydney : Holt, Rinehart and winstion.

Rothstein, Robert L. (1968) *Alliances and Small Power.* New York : Columbia University Press.

Roberts Adam (1976) *Nations in Arms : The Theory and Proactive of Territorial Defence.* London : Chatto & Windus.

Sieves, V. V. (1970) *Small Nation Survival : Political Defence in Unequal Conflicts.* Jericho, N. Y.: Exposition Press Inc.

Scholl, August and Brundtland, Arena Olau (1971) *Small States in International Relations.* Stockholm : Almqvist & wiksell.

Singer, David J. and Small, Melvin (1966) *The Composition and Status Ordering of the International System : 1815-1940.* New York : World Politics.

UNDP (2000) *Human Development Report.* UNDP.

Vital, David (1967) *The Inequality of States : A Study of Smaller Power in International Relations.* Oxford : The Clarendon Press.

Wolferes, Arnold (1962) *Discord and Collaboration : On International Poltics.* Baltimore : The Johns Hopkins Press.

Writh, D. A. (1989) *Climate Chaos.* Foreign Policy, No. 74

দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ আগষ্ট, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ সরকার (২০০১) *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০*। ঢাকা ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

হোসেন একরাম ও ইমাম কাজী হাসান (১৯৯৮) *বাংলাদেশের পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো।* ঢাকা ঃ বিপিএটিসি।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

বাজার অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র ও বাংলাদেশ

মোঃ হাসিবুর রহমান

Market Economy, Socialism and Bangladesh.

Md. Hasibur Rahman

Abstract : Socialism, before passing one hundred years become shy in the USSR (present CIS). In China also reforms measures have been accepted. But in Asia, Africa and in Latin America that means in the third world countries Socialism still have not been introduced though one of the state principles is 'Social and Economic Justice'. In all of our foreign agreements for loans condition is given that we must buy from the capitalist countries. So Socialism, not only in Bangladesh, but also in non-aligned group is being disturbed by the new imperialists-the developed donor countries. Karl Marx wrote to save capitalism by stopping exploitation to the labouring class. But the labouring class (both mental & physical) in the third world countries and in non-aligned group still could not test the touch of Socialism. Donors do not give Nobel Prize to socialist uncompromising writers, donors do not give World Bank Aid and IMP Aid to fill up import-export gap by commodity aid to Socialist countries for their system of production, banking and international trade and costing (not following the theory of international trade such as-comparative cost etc.) So for donation and cooperation of donors we are to fulfill the condition of aid and donation for increasing our growth rate by foreign aid which fills up our gap between internal saving and investment. Though there is possibility of Socialism in the third world countries in future but still our economy is poor, private enterprises are losing and not profitable. So they are to be nursed at present in different ways to be grown up. And at a stage when they will be group up we may take a step for Socialism and after a period we may take a new start by merging the property of the rich and the poor together. So, we shall then take up the New Economic Policy i.e. denationalization like Russia and China.

বর্তমানে সারা বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ মুক্ত বাজার অর্থনীতি। বিশেষ করে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের পর হতে বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সকল মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ

* পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

করেছে। বিষয়টি এখন আর শুধু অর্থনীতির সীমাবদ্ধ গন্ডীতে আবদ্ধ নেই। অর্থনীতি বিষয়ক এই আলোচনা স্পর্শ করেছে বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আমলা নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষকে।

বাজার বলতে আমরা সাধারণত সেই স্থানকেই বুঝি যেখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা মিলিত হয়। যেমন আমাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য বাজার, যেখান থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করি কিংবা বিক্রয় করি। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে এ ধরনের কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো সাধারণ দ্রব্য বা সেবার বাজারকে বুঝায়। যেমন শেয়ার বাজার, চামড়া বা চায়ের বাজার প্রভৃতি।

বাজার অর্থনীতি হচ্ছে কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সেই বিশেষ উন্নয়নমুখী প্রক্রিয়া যেখানে বাজার বিষয়ক ধারণা বা বাজার দর্শন কার্যকর। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এটি একটি দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। চাহিদা এবং সরবরাহ অর্থাৎ বাজার দ্বন্দ্বের দুটো দিক। এর পেছনে রয়েছে ক্রেতা এবং ভোক্তা। যাদের আচরণের মধ্যেও রয়েছে দ্বান্দ্বিকতার অস্তিত্ব। দাম কমলে ক্রেতা বেশি কেনে, কিন্তু বিক্রেতা সরবরাহ করে কম; অন্যদিকে দাম বাড়লে বিক্রেতা সরবরাহ বাড়ায় কিন্তু ক্রেতার চাহিদা কমে। বাজার অর্থনীতি এমন এক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যা দাম নির্ধারণের দায়িত্বটা বাজারের নিয়ামক শক্তিসমূহের ওপর ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতি। কোনো বাহ্যিক চাপ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে কোনো দ্রব্য বা সেবা সামগ্রীর দাম কমানো বা বাড়ানো বাজার অর্থনীতির মেজাজের পরিপন্থী।

বাজার অর্থনীতিতে আছে প্রতিযোগিতা, অনেক ক্রেতা-বিক্রেতা, ক্রেতা ও বিক্রেতার দর কষাকষিতে এবং চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে একটা মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মূল্য নিরূপিত হয় উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে। উৎপাদন খরচের মধ্যে আবার মূলধনী যন্ত্রপাতি ও বিল্ডিং এর খরচ বা ভাড়া অন্তর্ভুক্ত হয় না। এসব বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এমনকি ব্যাংকিং খাত থেকে ভর্তুকি হিসেবে কম সুদে পুঁজি সরবরাহ করা হয়

তারপর যে মূল্য নির্ধারণ করা হয় তা সবসময়ই আন্তর্জাতিক মূল্যের তুলনায় কম দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে Accounting Price বা Oportunity Cost বাজার অর্থনীতির মত খরচ হিসাব করা হলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও ভোগ্যপণ্যের মূল্য অনেক বেশী হতো Comparative Cost আরো বেশী হবার জন্য। তাই খরচের পরিমাণ বেশী হলেও তারা উৎপাদন করতে থাকে, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানীর উপর নির্ভর করে না। যে কারণে আইএমএফ অদ্যাবধি রাশিয়াকে সদস্য পদ দেয়নি এবং আমদানী-রফতানী ঘাট্তি পূরণের জন্য ভোগ্যপণ্য-উৎপাদন সহায়তা (Commodity Aid)ও দেয় না। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, সেখানে শর্ত বেঁধে দেয়া হয় যে, এই ঋণ শুধুমাত্র পুঁজিবাদী দেশসমূহ থেকে আমদানী অথবা অন্য কোনো পুঁজিবাদী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজেই ব্যবহার করা যাবে। তুলনামূলকভাবে, বাজার অর্থনীতিতে মূল্য নিরূপণ, ব্যাংকিং এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সব কিছুই ভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি হচ্ছে বাজারের স্বাভাবিক পরিণতি, কোনো আরোপিত তত্ত্ব নয়। বলা যায় বাজার অর্থনীতি অর্থনীতিকে তার স্বাভাবিক বিকাশের দিকে ধাবিত করার পক্ষে কাজ করে।

অপরপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর থাকে Administrative Command বা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। যেখানে মূল্য বেধে দেয়া হয়। উৎপাদক বা বিক্রেতার সাথে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ থাকে না। রাশিয়া এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদাহরণ।

বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

স্বাধীনতা উত্তরকালে পরিত্যাক্ত কলকারাখানাসমূহে উৎপাদন কম অথচ খরচ বেশি হওয়ায় সেগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভর্তুকি দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত শুধু পাট ও বস্ত্র কলগুলিতে দেয়া ভর্তুকির পরিমাণই দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ছয়শো কোটি টাকা। পাটকলগুলোর লোকসানের পরিমাণ এক হাজার দুইশো কোটি টাকা এবং গৃহীত ঋণের পরিমাণ চার হাজার কোটি টাকা। অদূর ভবিষ্যতে এই ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা থাকলেও লোকসান

পূরণের কোন ব্যবস্থাই নেই। সরকার সোনালী ব্যাংককে এক হাজার সাতশো কোটি টাকার বন্ড দিয়ে রেখেছে পাটকলগুলোকে ঋণ দেয়ার জন্য। টাকা ছাপিয়ে বা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এই ঋণ প্রদান করলে স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হবে। শ্রমিকের ও শিক্ষিত চাকরিজীবী শ্রেণীর Relative Price অনেক কমে যাবে Real Wages বা Salary-র তুলনায়। এই কারণেই বাংলাদেশ সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি গ্রহণ করে কলকারখানাগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর তথা জনগণকে এর অংশীদার করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশের স্বাধীনতার পর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সরকারি নিয়ন্ত্রণে এলে সরকারই সরাসরি ঐগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। শাসনতন্ত্রের তের অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় ও সমবায় মালিকানা স্বীকৃতি পায়। এখন পর্যন্ত বিরাষ্ট্রীকরণ নীতি বাংলাদেশে সফল হচ্ছে না এবং খোদ রাশিয়াতেও এটি এখন পর্যন্ত প্রস্তাব আকারে আছে। এমনকি সেখানে ছোট ছোট উৎপাদন ইউনিটগুলোতেও বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি সম্পূর্ণ কার্যকর হয়নি। জাতীয়করণকৃত কলকারখানাসমূহকে বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তর করে লাভজনক করার জন্য এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকেও বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুকূলে আনার জন্য অনেক কিছুর পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সকল পরিবর্তনগুলো উপলব্ধির জন্য রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব, ব্যর্থতা এবং বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি জানা প্রয়োজন। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এ সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

পরিকল্পিত অর্থনীতি ও সিআইএস (রাশিয়া)

১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বলশেভিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। দীর্ঘ অভ্যুত্থান শেষে ১৯২১ সালে ভ. ই. লেনিন ক্ষমতায় এসে নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) চালু করেন (১৯২৪) যা ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এরপর যোসেফ স্টালিন ক্ষমতায় এলে প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নতুন অর্থনৈতিক নীতি এবং পরবর্তী দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে রাষ্ট্রীয় মালিকানার নীতি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। এই নীতি

অনুযায়ী, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদকগণকে অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় এবং মূল্য নিরূপণে শুধু শ্রমিকের মজুরিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কারখানায় লোকসান হলে তা ভর্তুকী দিয়ে পুষিয়ে নেয়া হয়। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতার মনোভাব কিংবা টিকে থাকার প্রশ্ন লোপ পায়, উৎপাদনে নতুনতর চিন্তা-চেতনা বিশেষ করে ব্যক্তিগত আগ্রহের অভাব প্রকট হতে থাকে। ১৯৮৫ সালে গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পর যদিও সব কলকারখানাই লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে চলতে শুরু করে এবং বিরাষ্ট্রীয়করণ চেতনাও গুরুত্ব পায়, কিন্তু তথাপিও, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, দালানকোঠা প্রভৃতিকে পণ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়না, পণ্য বলতে শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্যকেই বোঝায় তবে ঐগুলোকে পণ্য হিসেবে গণ্য না করলেও শুধু লাভ-লোকসানের হিসেবে উৎপাদনের পরিকল্পনার জন্যই কাঁচামাল, দালানকোঠার ভাড়া ও যন্ত্রপাতির মূল্য হিসেবে ধরা হয়, যাতে লোকসানে উৎপাদন না হয় এবং পুঁজি বাড়ে।

Marxist View (Utopian View) নিয়েই এই কার্যক্রম চালনা করা হয়। এর জন্য স্টেট কমিটি-র নাম ছিল ভেসেংকা এবং পরে একে গস্প্লান (Gosplan) এর সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়। পল্লীতে কৃষি-শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কুটির শিল্পের জন্য রাষ্ট্রিয় কমিটি থাকে। রাস্তা, খাল প্রভৃতি বিনা মজুরিতে শ্রমিকদের দিয়ে তৈরি করে অবকাঠামো মজবুত করা হয় (যেমন মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের দিয়ে এ ধরনের কাজ করানোর প্রচেষ্টা নিলে তারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে)। জমিতে রাষ্ট্রিয় মালিকানা কায়েম হওয়াতে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তা ও খাল কাটায় কাজ করতে থাকে। এমনকি সবজি বাগান, হাঁস-মুরগী পর্যন্ত রাষ্ট্রিয় মালিকানায় আনা হয়। এর ফলে ১৯২১ সালে উৎপাদন ১৯১৩ সালের চাইতেও অনেক কমে যায়। অর্থাৎ ১৯১৩ সালে যেখানে রাশিয়া সমস্ত পূর্ব ইউরোপে খাদ্যের যোগান দিত সেখানে ১৯২১ সালে সে নিজেই খাদ্য সংকটে পতিত হয়। এমতাবস্থায় পূর্বোল্লিখিত নতুন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হয় এবং অন্তত সবজি বাগানগুলো ব্যক্তি মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া শুরু হয়। কার্ল মার্কস এর "Critique of the Gotha Programming" ক্ষেতে খামারে কার্যকর করা হয়। 'Quality' 'Efficiency and Quantity' দিয়ে কাজের পরিমাপ করা

হতো। একজন শ্রমিক কত ঘন্টা কাজ করে এবং ঘন্টাপ্রতি কতটুকু পরিমাণ কাজ করে এই হিসাবে মজুরি দেয়া হতো।

রাশিয়ার ধনী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ

১৯৭০ সালের দিকে বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এ সময় রাশিয়া নিজেকে বিশ্ব শক্তি মনে করতে থাকে এবং সামগ্রিকভাবে তার নাগরিক চাহিদা ও ভোগবাদিতা প্রবৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মত 'Cyclical Fluctuation' নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় Depression ধীরে ধীরে দীর্ঘ মেয়াদি হয়। যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন বেড়ে যায় এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কমে যায়। ভোগ্যপণ্য আমদানীর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং Commodity Aid-এর আশায় রাশিয়া আইএমএফ-এর সদস্য পদ লাভে সচেষ্ট হয়।

১৯৮৫ সালে গর্বাচেভ ক্ষমতায় এলে আবার নতুন অর্থনৈতিক নীতি-র মত ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করেন। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অনেকটা সংকুচিত করেন এবং বিশেষ করে বার্টারের বদলে মূল্য ও বাজার ব্যবস্থার প্রর্তন করেন। শুধু কৃষির Collective Farming-ই নয়, ছোট ছোট শিল্প ইউনিটগুলোতেও এই ধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলে।

এর ফলে ভোগবাদিতা কমে যায় এবং শ্রমিকের ইনসেন্টিভ কমে যায়। এডিপি-র প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯১-তে ১ শতাংশে নেমে আসে। কৃষিকার্য 'Collectivization' এর মাধ্যমে হলেও বাজার অর্থনীতির সবগুলো বৈশিষ্ট্য সিআইএস এখনও অর্জন করেনি। বর্তমানে এন্টারপ্রাইজ হতে অর্ডার ভাউচার গসপ্লান এ বিভিন্ন স্তর পার হয়ে যায় এবং ভোগ্যপণ্য বাজারে কম থাকলে পলিট ব্যুরো (যা গসপ্লানের চাইতে অনেক ক্ষমতাশালী) খুব কম সময়ই উৎপাদনের নির্দেশ দিয়ে থাকে। উচ্চ পর্যায় হতে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে ভোক্তারা তাদের চাহিদামত ভোগ্যপণ্য পায়না। গুড়া সাবানের চাহিদা না থাকলেও তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তারা মুক্ত বাজারের ভোক্তাদের মতো পণ্য ক্রয়ের সন্তুষ্টিকে পূর্ণতা দিতে পারে না কাম্যতার তত্ত্ব অনুযায়ী।

বাজার অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ

বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং জনগণের কল্যাণ সাধন সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও মুদ্রাস্ফীতি আছে, তবে তা 'disguised subsidy' বা ছদ্ম-ভর্তুকীর জন্য আঁচ করা যায় না। সেখানে বাজার দর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেঁধে দেয়া হয়।

বাংলাদেশে ধীরে ধীরে দাম বাড়ার ফলে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়ছে। 'Price escalation' এর জন্য এডিপি বরাদ্দ ও সংশোধিত বাজেট বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে মজুরি ও বেতন। এছাড়া বাংলাদেশ দেশি এবং বিদেশী পুঁজির জন্য একটি সম্ভাবনাময় বাজার। তাই শুধু অর্থশাস্ত্র অনুসারে নয় অর্থনীতির 'Rational Behaviour' অনুসারে ধার করা পুঁজির সুদ ও আসল সমেত 'Amortization Schedule' অনুসারে পরিশোধ করা উচিৎ। অপারগতায় কর্তৃপক্ষ হতে 'Moratorium Grant' করিয়ে নেয়া বাঞ্ছনীয়। ভোগ্যপণ্য ও শ্রমিকের বাজারেও Rational Behaviour আবশ্যক অর্থাৎ দাম বাড়লে কম কেনা এবং দাম কমলে বেশি কেনা। এবং সর্বোপরি প্রয়োজন উৎপাদনের রাজনীতি চালু করা। সম্পদ নয় শুধু পরিশ্রমকে পুঁজি করে বিশ্বের অনেক দেশ আজ অনেক এগিয়ে গেছে। যেমন, জাপান। সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ কম, সেখানকার জমিও তেমন উর্বর নয়। অথচ তারা শ্রমলব্ধ জলবিদ্যুৎ দিয়ে নানাবিধ ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক অসংখ্য পণ্যের অন্যতম উৎপাদক এবং বিক্রেতা। তেমনি জার্মানদেরও সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে তাদের অমূল্য শ্রম। বেশি শ্রম, কম বিলাসিতা এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমেই বেকারত্ব দূর করে, উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সহাবস্থান করছে। বর্তমানে সমাজতন্ত্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচাররূপে প্রতিস্থাপিত করে গণতন্ত্রের সাথে এর সমন্বয়ের প্রক্রিয়া চলছে। তাই ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি মালিকানা, কোথাও সমবায় মালিকানা আবার ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বলবৎ আছে। যা দেশ এবং জনগণের প্রয়োজনের তাগিদেই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সময়ের বিবর্তনে বা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে যে

কোনো মুহূর্তেই যে কোনো বিষয় পরিবর্তিত হতে পারে। তাই আমাদের সব সময়ই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত এমনিক ত্যাগ স্বীকার-এর জন্যও তৈরি থাকতে হবে।

বাজার অর্থনীতির অভাবে রাশিয়াতে যেমন তেমনি আমাদের অর্থনীতিতেও ফাঁকি দেবার সুযোগ বেশি। যে কারণে শ্রমিকেরা সরকারি মালিকানায় থাকতে বেশি আগ্রহী। ভর্তুকির জন্য দ্রব্যমূল্য কম বটে কিন্তু ক্রমবর্ধমান হারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। ব্যক্তি মালিকানা এসবের অবসান ঘটাবে এবং Neoclassical Price Paradigm-এর রাস্তা পরিস্কার করবে।

তথ্য নির্দেশিকা

কল্লোল, হাসনাত কবীর-সম্পাঃ (১৯৯৭) *বাজার অর্থনীতি*। ঢাকা : সন্দেশ।

পাল, বিরূপাক্ষ (১৯৯৭) *মুক্তবাজার অর্থনীতি* ও বাংলাদেশ। ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স।

মাহমুদ, আনু (১৯৯৯) *মুক্ত বাজার, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি*। ঢাকা : পরমা।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৫) *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব?* ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ ঃ প্রশাসন ও সামন্ত প্রভুদের ভূমিকা

মোঃ শরীফ হাছান *

Great Revolt of 1857 : Role of Administration and Feudal Lords. Md. Sharif Hasan

Abstract : The revolt of 1857 is a glorious chapter in the history of Indian sub continent. British dominance began in this subcontinent in 1757 after the war of Plassey. The British rulers started exploitation in this land. The revolt was an outburst of the misrule of the British East India Company who represented the British crown. In northern India, the revolt became a people's war. The Deccan and eastern part of India remained almost unaffected. The revolt continued until 1859. It ended with a failure. The British administrators put the situation under control through their dynamism and ruthlessness. Most of the landlords and native members of the administration sided with their British masters. On the other hand, the rebels lacked able leadership and unity. However, the revolt will ramain as a source of inspiration for the freedom loving people of the whole world. The study aims to analyse the main reasons specially the influence of colonial exploitation and land management for the revolt, its major events and reasons of its failure with special reference to the role of British administration and local landlords to calm down the rebellion.

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা হয়। পরবর্তী একশত বছরের মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসকদের করতলগত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগণ অন্যান্য উপনিবেশের মতো ভারতবর্ষে শুরু করে শোষণ, নির্যাতন সর্বোপরি নির্বিচার সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচার। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃত হলেও প্রধানতঃ উত্তর ও মধ্যভারতেই বিদ্রোহের প্রকোপ ছিলো সবচেয়ে বেশী। ১৮৫৭ সালে সূচিত হওয়া এ বিদ্রোহের স্থায়িত্ব ছিলো ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত। বস্তুত এটা ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে

* সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

এর সমাপ্তি ঘটলেও এ বিদ্রোহ সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসে চিহ্নিত হবে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অভিনবত্ব এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর প্রসারে, ব্রিটিশ শক্তির বিপদের গুরুত্বে এবং এতে বেসামরিক জনগণের অংশগ্রহণে (বন্দোপাধ্যায়,১৯৮৬)।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে নিছক সিপাহি বিদ্রোহ অথবা স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে কিনা এনিয়ে এক সময় ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য থাকলেও বর্তমানে এ বিষয়ে অধিকাংশ লেখক ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করলে এর গুরুত্বকে খাটো করা হবে। আনুমানিক প্রায় তিন কোটি লোক এ মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। উত্তর প্রদেশসহ কিছু কিছু এলাকায় এ বিদ্রোহে জমিদার এবং আপামর জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতে এ বিদ্রোহের তেমন প্রভাব পড়েনি। তাছাড়া জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলোনা।

তবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিরন্তর শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপামর জনগণের মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয় যার সশব্দ প্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মাধ্যমে। ১৮৫৭ সালের ২৩শে জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ডিজরেইলী এ বিদ্রোহকে সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত না করে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন (Marx and Engels, 1988)। প্রধানত ইংরেজ এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ফরমায়েশী লেখকগণই এ মহাবিদ্রোহকে নিছক সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্রিটিশ শাসকদের সীমাহীন অন্যায়, অবিচারকে আড়াল করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিদ্রোহীদের মাঝে অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন নেতার অভাব ছিলো। বাহাদুর শাহ্, নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, তাতিয়া তোপী, বখত খাঁ, মৌলভী আহমদুল্লাহ প্রমুখের দেশপ্রেম ও নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত হলেও এই সংগ্রামকে সাফল্যমন্ডিত করার মতো যোগ্যতা তাদের ছিলোনা। অস্ত্রশস্ত্র ও শৃঙ্খলার দিক দিয়ে বিদ্রোহীরা তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায় ছিলো দুর্বলতর। অন্যদিকে ব্রিটিশ বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে বিদ্রোহীদের চেয়ে ছিলো অনেক শক্তিশালী।

তাদের শৃঙ্খলাবোধ ছিলো কিংবদন্তী তুল্য। উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে একটি আধুনিক এবং সংগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ-দেশীয় নির্বিশেষে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ বিদ্রোহ দমনে কোম্পানির প্রভুদের সর্বতোভাবে সহায়তা করে। কোম্পানির চাকুরীতে নিয়োজিত ভারতীয় বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিদ্রোহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের বিদেশী প্রভুদের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য বজায় রাখে। উপরন্ত ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উপমহাদেশে ব্রিটিশের অনুগত জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। নব প্রতিষ্ঠিত এ জমিদার শ্রেণী বিদ্রোহ দমনে অস্ত্র, অর্থ ও লোকবল দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য করে। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ প্রভুদের সপক্ষে দেশীয় নৃপতি ও জমিদারদের নৃশংসতা ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের শ্বেতকায় প্রভুদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতি দেশীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ভূস্বামী শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা ও আনুগত্য এ সংগ্রামে ব্রিটিশ শাসকদের জয়লাভ এবং বিদ্রোহীদের পরাজয় ত্বরান্বিত করতে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

প্রধান প্রধান কারণসমূহঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ মুখ্যত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপকতা, অর্থনৈতিক শোষণ, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে দেশীয় ও ইংরেজ কর্মচারীদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার বৈষম্য এবং দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এছাড়া ইংরেজ শাসকদের কিছু কিছু সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ যেমন সতীদাহ প্রথা, নরবলি, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি কুপ্রথা রদ করার ফলে জনগণের একাংশ শাসক শ্রেণীর উপর ক্ষুব্ধ হয়। যেমন, লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিংক (১৮২৮-৩৫) এর সময় সতীদাহ প্রথা বাতিলের পক্ষে বড়লাট বরাবর তিনশত দরখাস্ত জমা পড়ে অন্যদিকে এ প্রথা বহাল রাখার পক্ষে জমাকৃত দরখাস্তের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজারের বেশী (গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ১৯৯০)। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালা গ্রহণ করে। কোম্পানি প্রশাসনের গ্রাসের কবলে পতিত হতে থাকে একে একে দেশীয় রাজ্যগুলো। লর্ড হেস্টিসের যুদ্ধবাদী নীতি, লর্ড ওয়েলেসলির

অধীনতামূলক মিত্রতা, লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতির মাধ্যমে দেশীয় রাজাদের ক্রমে ক্রমে তাঁদের রাজ্য থেকে উৎখাত করা হয়। নাগপুর, উদয়পুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর, বেরার এভাবে কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোম্পানি প্রশাসনের এ সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার ফলে উপমহাদেশের অধিকৃত ভূ-খন্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। পূর্বতন রাজা, ভূস্বামী এবং তাদের সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীগণ বেকার ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর পঁচাত্তর হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়। পঁচিশ হাজার ব্রাহ্মণকে দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয় (কবিরাজ ১৯৮০)। এভাবে বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের পিতৃপুরুষের আমলের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে এ শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোম্পানির কুশাসনের ফলে জনগণের জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কায়েম করে দ্বৈত শাসন। এ ব্যবস্থায় শাসন ও বিচার সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলার দুর্বল নবাবের উপর। অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রহের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় কোম্পানির হাতে। ফলে সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা। নবাবের দুর্বলতা, ইজারাদারদের অত্যাচার, পীড়নে জনজীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। এহেন সীমাহীন অপশাসনের ফলে ইংরেজী ১৭৭০, বাংলা ১১৭৬ সালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিতি। বাংলার প্রায় অর্ধেক লোক এ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায় (ইসলাম ও অন্যান্য, ১৯৮৭)। বহু জমিদার হয় দস্যুদলকে আশ্রয়দান করে অথবা নিজেরাই দস্যুদল গঠন করে লুটতরাজ চালাতে থাকে।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। জমিদারগণ বছরে নির্ধারিত হারে খাজনা পরিশোধ করে চিরস্থায়ীভাবে জমিদারি ভোগের অধিকার লাভ করেন। এর ফলে ইংরেজদের অনুগত একটি ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ কোম্পানির নির্ধারিত হারে বার্ষিক খাজনা লাভ নিশ্চিত হয়। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো সূর্যাস্ত আইন। এ আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমিদারের জমিদারি

অধীনতামূলক মিত্রতা, লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতির মাধ্যমে দেশীয় রাজাদের ক্রমে ক্রমে তাঁদের রাজ্য থেকে উৎখাত করা হয়। নাগপুর, উদয়পুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর, বেরার এভাবে কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোম্পানি প্রশাসনের এ সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার ফলে উপমহাদেশের অধিকৃত ভূ-খন্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। পূর্বতন রাজা, ভূস্বামী এবং তাদের সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীগণ বেকার ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর পঁচাত্তর হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়। পঁচিশ হাজার ব্রাহ্মণকে দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয় (কবিরাজ ১৯৮০)। এভাবে বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের পিতৃপুরুষের আমলের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে এ শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোম্পানির কুশাসনের ফলে জনগণের জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কায়েম করে দ্বৈত শাসন। এ ব্যবস্থায় শাসন ও বিচার সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলার দুর্বল নবাবের উপর। অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রহের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় কোম্পানির হাতে। ফলে সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা। নবাবের দুর্বলতা, ইজারাদারদের অত্যাচার, পীড়নে জনজীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। এহেন সীমাহীন অপশাসনের ফলে ইংরেজী ১৭৭০, বাংলা ১১৭৬ সালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিতি। বাংলার প্রায় অর্ধেক লোক এ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায় (ইসলাম ও অন্যান্য, ১৯৮৭)। বহু জমিদার হয় দস্যুদলকে আশ্রয়দান করে অথবা নিজেরাই দস্যুদল গঠন করে লুটতরাজ চালাতে থাকে।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। জমিদারগণ বছরে নির্ধারিত হারে খাজনা পরিশোধ করে চিরস্থায়ীভাবে জমিদারি ভোগের অধিকার লাভ করেন। এর ফলে ইংরেজদের অনুগত একটি ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ কোম্পানির নির্ধারিত হারে বার্ষিক খাজনা লাভ নিশ্চিত হয়। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো সূর্যাস্ত আইন। এ আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমিদারের জমিদারি

বাজেয়াপ্ত করা হতো। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জমিদারিগুলির প্রায় অর্ধেক পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। এটাও মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুতে রেখেছিলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অন্যদিকে জমিদারগণ প্রজাদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো রাজস্ব আদায় করতে পারতেন। জমিদার এবং তাদের ইজারাদার, লাঠিয়ালদের অত্যাচারে অনেক কৃষক সর্বস্ব হারায়। এদের অনেকে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। কোম্পানী এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। অনেকে মনে করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষির উন্নয়ন ঘটেছিলো। প্রকৃত ঘটনা তা নয়। কৃষির কৌশল ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধন করে সমপরিমাণ জমিতে অধিক ফসল ফলানো এবং উদ্বৃত্ত ফসল লাভজনকভাবে বাজারজাত করার ব্যবস্থাকে বলা যায় কৃষির উন্নতি, আর চিরাচরিত কৃষি কৌশলের অধীনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে পতিত জমি আবাদ করা হয় তা হচ্ছে কৃষির সম্প্রসারণ। সে সম্প্রসারণে কৃষকের অর্থনীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষির উন্নতি হয়নি। কৃষির সম্প্রসারণ হয় (ইসলাম ও অন্যান্য, ১৯৮৭)। এ ব্যবস্থার ফলে বঙ্গদেশের কৃষক সর্বনাশের চরম সীমায় উপনীত হয়।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করে। কোম্পানির সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন ছিলো অর্থনৈতিক শোষণের লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার স্বরূপ। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনাকাল হিসেবে ধরা হয় ১৭৬০ সালকে। ভারত থেকে লুণ্ঠিত অর্থ সম্পদ এ বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপমহাদেশের শিল্পপতিরা ইংল্যান্ডের বাজারে প্রবেশাধিকার যাতে না পায় সেজন্য ১৭০১ এবং ১৭২৯ সালে ইংল্যান্ড ভারতে প্রস্তুত শিল্পজাত পণ্যের আমদানী নিষিদ্ধ এবং আমদানীকৃত ভারতীয় তুলার উপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে দেয়। ১৭৫৭ সালের পর কোম্পানির শাসকেরা ভারতে তাদের পণ্যের একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠার লক্ষে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধনে নিয়োজিত হয়। বাংলার মসলিনের খ্যাতি ছিলো বিশ্বজোড়া। বিলাতী কাপড়ের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে মসলিন শিল্প ধ্বংস করে দেয়া হয়। এমনকি মসলিন শিল্পীদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কেটে নেয়া হয় এবং যাবতীয় দেশীয় পণ্যের উপর অত্যধিক শুল্ক

আরোপ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৮৪০ সালে মন্টগোমারী মার্টিন বলেন, গত পঁচিশ বছর ধরে আমরা ভারতকে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য করেছি, অথচ ঠিক এই পঁচিশ বছর ধরে আমরা ব্রিটেনে রপ্তানীকৃত ভারতের পণ্যের উপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছি। এই শুল্ক ১০% থেকে ২০%, ৩০%, ৫০%, ১০০%, ৫০০% এমনকি ১০০০% পর্যন্ত উঠেছে। কাজেই ভারতের সঙ্গে খোলা বাজার স্থাপনের চেষ্টা চলছে বলে যে রব উঠেছে সেটা একটা ধুয়া মাত্র। আসলে ইংল্যান্ড ভারতে খোলা বাজারের অধিকার পেয়েছে, ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে খোলা বাজারের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি (কবিরাজ, নরহরি ১৯৮৭)। একদিকে বিলাতী পণ্যে ভারতীয় বাজার হতে থাকে সয়লাব অন্যদিকে দেশীয় শিল্প ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। কোম্পানির প্রশাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অবস্থা দিন দিন খারাপ থেকে অধিকতর খারাপের দিকে যেতে থাকে। বিরাট শহরগুলো ধীরে ধীরে শ্মশানে পরিণত হয়। ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত মেশিনে তৈরী তুলাজাত জিনিসপত্র যেমন তাতিঁদের ধ্বংস ডেকে আনে, তেমনি মেশিনে তৈরী সূতা তাদের জীবিকা নষ্ট করে দেয়। কার্ল মার্কস বলেন ঃ From 1818 to 1836 the export of twist from Great Britain to India rose in the proportion of 1 to 5200. In 1824 the export of British Muslins to India hardly amounted to 1000000 yards, while in 1837 it surpassed 64000000yards. But at the same time the population of Dacca decreased from 150000 inhabitants' to 20000" (Marx উদ্বৃতি কবিরাজ, ১৯৮৭)।

১৭৮৭ সালে ঢাকা থেকে ইংল্যান্ডে মসলিন চালান যেত ৩০ লক্ষ টাকার, ১৮১৭ সালে এই চালান একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। নিরন্তর শোষণের ফলে ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ তাঁতি এবং কুটির শিল্পে নিয়োজিত কারিগর ও শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। অসংখ্য সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবার কাজের সন্ধানে শহর ছেড়ে জীবিকার খোঁজে গ্রামে চলে আসতে বাধ্য হয়। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ শহরকে লন্ডনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ১৮৪০ সালে মুর্শিদাবাদ শহর শ্মশানে পরিণত হয়। ব্রিটিশ বণিকদের মুনাফার স্বার্থে প্রবর্তিত হয় নীলচাষ।

ধানের জমিতে নীলচাষ করা হয়, অন্যদিকে চাষীদের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করা হয়। চাষীরা নীলকরদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে পড়ে। এভাবে এদেশী চাষীদের হাতে এবং ভাতে উভয় প্রকারে মারার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা হয়। মুঘল আমলেও সাধারণ জনগণ অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। তবে তখন শোষণলব্ধ অর্থ ভারতের অভ্যন্তরেই খরচ করা হয়। এটা ছিলো অভ্যন্তরীণ শোষণ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা শোষণলব্ধ অর্থ ব্রিটেনে পাচার করে। এ শোষণের ফলাফল ছিলো অধিকতর ভয়াবহ। ফলে দেশে বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামরিক প্রশাসনেও বিভেদমূলক নীতি অনুসরণ করে। কোম্পানির দেশীয় এবং ইংরেজ সৈনিকদের মধ্যে সুযোগ সুবিধার সমতা ছিলোনা। ইংরেজ সৈনিকগণ দেশীয় সৈনিকদের চেয়ে অনেক বেশী বেতন ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতো। একই পদমর্যাদার একজন দেশীয় সৈন্য যেখানে মাসে নয় টাকা বেতন পেতো সেখানে একজন ইংরেজ সৈনিকের মাসিক বেতন ছিলো চল্লিশ টাকা। দেশীয় সৈনিকগণ দেশবাসীর ঘৃণার পাত্র হয়েও বিদেশী প্রভুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে কিন্তু সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে তাদের করা হয় বঞ্চিত। ভারতীয় সিপাহিদের পদোন্নতির সুযোগও ছিলো অল্প। একজন ভারতীয় সিপাহিকে সুবেদারের পদের চেয়ে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করা হতোনা। এ সর্বোচ্চ পদের বেতন ছিলো ৬০-৭০ টাকার মধ্যে। বস্তুত একজন সিপাহির জীবন ছিলো যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। ভারতীয় হওয়ার অপরাধে এভাবে হীনতার বোঝা বহন করে চলা সিপাহিদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে টি আর হোমস বলেন যে, একজন ভারতীয় সিপাহি হায়দার আলীর মতো নৈপুণ্য দেখিয়েও কখনো আশা করতে পারতোনা যে তার বেতন একজন সাধারণ ইংরেজ সৈনিকের সমতুল্য হবে। তিরিশ বছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার পরও মিলতো না পদোন্নতি। ইংল্যান্ড থেকে সদ্য আগত একজন তরুণ সৈনিকের উদ্ধত আচরণ বা হুকুম তাকে মেনে চলতে হতো (চন্দ্র, বিপিন ১৯৮০)। নিগার, শূয়োর ইত্যাদি সম্বোধন ছিলো তাদের নিত্য দিনের পাওনা।

এ সময় দেশীয় সিপাহিদের ধর্মবিশ্বাস হয়ে পড়ে হুমকীর সম্মুখীন। সামরিক ছাউনীতে সরকারী খরচে পাদ্রী পোষা হতে থাকে। এসব পাদ্রী দেশীয়

সিপাহিদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হয়। উপমহাদেশে প্রচলিত ধর্মগুলো সম্পর্কে পাদ্রীগণ প্রায়ই আপত্তিকর উক্তি করতো। দেশীয় সিপাহিগণ নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করতো। কিন্তু কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এসব নিয়ম কানুন মেনে চলার পথে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিলো যে কোন সিপাহি তার জাতি নির্দেশক কোন চিহ্ন ধারণ করতে পারবে না। এমন কি দাড়ি রাখা, পাগড়ি পরা এবং কপালে তিলক কাটাও নিষিদ্ধ ছিলো। এক্ষেত্রে তাদের কোন আপত্তি বিবেচনায় আনা হতো না। দেশীয় সিপাহিদের অনেক সময় তাদের স্বধর্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হতো। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে আইন জারী করা হয়েছিলো যে, কোন নবনিযুক্ত সিপাহীকে প্রয়োজনবোধে সাগরপারের কোন দেশে অর্থাৎ ভারতের বাইরে যেতে হতে পারে এবং এক্ষেত্রে কোন ধরনের আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এটা সিপাহিদের কাছে ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিলো। কারণ তখনকার দিনে হিন্দুদের কাছে সাগর পার হওয়া ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী অর্থাৎ জাতিনাশ হিসেবে বিবেচিত হতো। পূর্বে পরদেশে যুদ্ধ করতে গেলে দেশীয় সিপাহিদের অতিরিক্ত ভাতা দেয়া হতো। হঠাৎ কোম্পানির সামরিক প্রশাসন হুকুম জারী করে যে, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে যুদ্ধ করতে গেলে সিপাহিগণ অতিরিক্ত ভাতা বা বাট্টা পাবে না। এতে দেশীয় সিপাহিদের আয় কমে যায় এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কোম্পানির বহু সিপাহি অযোধ্যার অধিবাসী ছিলো। তাদের মাতৃভূমি ইংরেজ কোম্পানি কুশাসনের মিথ্যা অজুহাতে দখল করে নেয়ার ফলে সিপাহিদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোম্পানির প্রশাসন নজিরবিহীন নৃশংসতার সঙ্গে এসব বিদ্রোহ দমন করে। কোম্পানির সেবক হওয়া সত্ত্বেও সিপাহিগণ তাদের প্রভুদের এহেন নিষ্ঠুরতায় ভিতরে ভিতরে হয় ক্ষুদ্ধ। তারা তাদের সুপ্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

বিদ্রোহের সূচনাঃ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সৃষ্ট কিছু দেশীয় রাজা, জমিদার এবং অনুগ্রহপুষ্ট মুৎসুদ্দী শ্রেণী ছাড়া আপামর জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিলো। ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃক সূচিত শোষণ এবং নিপীড়নমূলক কর্মকান্ডের দ্বারা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। তাই ভিনদেশী শাসকদের উৎখাত করার লক্ষ্যে তাদের উপযুক্ত সময়ে আঘাত করার জন্য সচেতন জনগণের উৎসাহের অন্ত ছিলো না। কিন্তু সংগ্রামের দিনক্ষণ নির্ধারণ মোটেই সহজ ছিলো না। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ইংরেজ কোম্পানির গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা এক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ ছিলো। বিদ্রোহের উদ্যোক্তাগণ অস্ত্র ও অর্থ বলে বলীয়ান না হলেও মনোবল, সাহস সর্বোপরি দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত ছিলো। বিদ্রোহ শুরুর আগে রক্তবর্ণ পদ্ম ও চাপাটিকে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে ধরে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হলো বিভিন্ন সেনা ছাউনী এবং বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের কাছে। ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী, ফকির ও মাদারীগণ বিদ্রোহের সপক্ষে প্রচারণা শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সিপাহিদের নিয়ে গঠিত রেজিমেন্টগুলো এক গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বাধিক সক্রিয় ছিলেন অযোধ্যার মৌলভী আহমদউল্লাহ, আজিমুল্লা খান, পেশোয়ারে দত্তকপুত্র ধন্দুপন্থ যিনি নানা সাহেব নামে সমধিক পরিচিত। এদের সার্বিক তত্ত্বধানে সহস্রাধিক বার্তাবাহক সাধু, ফকির, মৌলভী, ভিস্তিওয়ালা, ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে বিদ্রোহের বার্তা বহন করে তা পৌঁছে দেয় দূর দূরান্তরে। স্থির হয় যে পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিন অর্থাৎ ২৩শ জুন ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্রোহ শুরু হবে (ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৬৯)। অন্য মতে ৩১শে মে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়। কোম্পানির সৈন্যদলের তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার সদস্যের মধ্যে দুই লক্ষ সত্তর হাজার ছিলো দেশীয়। অবশিষ্ট মাত্র চুয়ান্ন হাজার ছিলো ইউরোপীয়। বিভিন্ন সেনানিবাসের দেশীয় সিপাহিগণ যখন বিদ্রোহের ডাকের জন্য প্রতীক্ষারত তখন হঠাৎ করে এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে। পুরোনো ব্রাউন ব্রাস রাইফেলের পরিবর্তে প্রবর্তিত এনফিল্ড রাইফেল ওজনে ছিলো হাল্কা, এর পাল্লাও ছিলো বেশী। এ রাইফেলের কার্তুজ দাঁত দিয়ে ফেটে রাইফেলে ভরতে হতো। গুজব রটে যে, এ কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত রয়েছে। গরু ও শুকরের মাংস যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট বর্জিত মাংস। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিগণ নিজ নিজ ধর্ম নাশের আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে। তারা এ কার্তুজগ্রহণে অস্বীকার করে। কোম্পানি প্রশাসন সিপাহিদের অভিযোগের সারবত্ত্বা যাচাই করেনি। ফলে দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। কার্তুজে গরু ও শুয়োরের চর্বি মিশ্রিত থাকার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ছিলো গুজব এবং কোম্পানির

কুশাসনের বিরুদ্ধে আসন্ন বিদ্রোহে সিপাহিদের শামিল করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এ গুজব ছড়ানো হয়েছিলো। কোম্পানির প্রশাসন বিদ্রোহ সংঘটনে মৌলভী আহমদউল্লাহ ও নানা সাহেবের নেতৃত্বে চলমান কর্মকান্ড এবং কার্তুজ সংক্রান্ত গুজবের মোকাবেলায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দান করে। এ দুটো ঘটনা কোম্পানি সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে অবস্থিত ৩৪নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর ব্রাহ্মণ সিপাহি মঙ্গল পান্ডে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি প্রশিক্ষণকালে চর্বি মাখানো কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইংরেজ সৈন্যাধক্ষকে হত্যা করে সকল দেশীয় সিপাহিকে বিদ্রোহ ঘোষণার আহ্বান জানান। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। বিচারে মঙ্গল পান্ডের ফাঁসি হয়। এটা ছিলো একক বিদ্রোহ। উল্লেখ্য মঙ্গল পান্ডের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকগণ বিদ্রোহী মাত্রই 'পান্ডি' (Pandey) হিসেবে আখ্যায়িত করতো।

বিদ্রোহের প্রধান প্রধান ঘটনাঃ ১০ই মে ১৮৫৭ সালে মীরাটের দেশীয় সিপাহিগণ বিদ্রোহ করে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে। মোট তিন হাজার বিদ্রোহীর একদল দিল্লীর দিকে রওনা হয়, অপর দল বেরিলিতে বিদ্রোহ সংগঠনের জন্য সেখানে গমন করে। ১২ই মে বিদ্রোহীরা দিল্লী দখল করে আবু জাফর সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাদুর জাফর শাহ (২য় বাহাদুর শাহ)কে ভারতবর্ষের সম্রাট ঘোষণা করে। যদিও তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী মাত্র। আপামর জনগণের সমর্থনের জন্য বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করা জরুরী ছিলো। হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্তরায় দূর করার জন্য বাহাদুর শাহ দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর যে সকল নৃপতি বিদ্রোহে সহায়তা করেছেন তাদের সমবায়ে গঠিত সংসদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করে তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করবেন। তাঁর এ ঘোষণায় যারা ইংরেজ শাসনের অবসানে ভারতবর্ষে আবার মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের আশংকা করছিলেন তাঁরা আশ্বস্ত হন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর দিল্লীর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিলো। কিন্তু বাহাদুর শাহ সম্রাট ঘোষিত এবং বিশ সহস্রাধিক বিদ্রোহীর সমাবেশের পর

এর গুরুত্ব আবার বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে দিল্লীই ছিলো বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। তাই ইংরেজগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান এমনকি বাইর থেকেও বহু সৈন্যসামন্ত এবং গোলাবারুদ আমদানী করে। আম্বালা থেকে সৈন্য আমদানী করে ইংরেজগণ দিল্লীর উত্তর দিকে অনুচ্চ পাহাড়গুলো প্রথমে দখল করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারা শহর দখলের জন্য হামলা শুরু করে। ক্রমাগত ছয়দিন প্রাণপণ চেষ্টা এবং প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের পর দিল্লীর প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী ফটক কামানের গোলায় উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজগণ শহরে প্রবেশ করে ২০শে সেপ্টেম্বর। বিদ্রোহীদের সর্বাধিনায়ক বখত খানের নগর ত্যাগের অনুরোধ উপেক্ষা করে বাহাদুর শাহ বিশ্বাসঘাতক ইলাহী বখশ ও রজব আলীর পরামর্শে সপরিবারে বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধিভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাহের পরিবারের কারো ক্ষতি করা হবেনা ইলাহী বখশ এবং রজব আলীর মারফত ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এ আশ্বাসবাণী পেয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর বাদশাহ বাহাদুর শাহ ক্যাপ্টেন হডসনের নিকট সপরিবারে আত্মসমর্পণ করেন। নিষ্ঠুর হডসন বাহাদুর শাহের দুইপুত্র মির্জা খিজির সুলতান ও মির্জা মুগল এবং পৌত্র মীর্জা আবু বকরকে বিনা কারণে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করেন এবং তাঁদের মৃতদেহ কোতওয়ালীর সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দিল্লী দখলের প্রথম তিন দিন প্রায় ছাব্বিশ হাজার নারী পুরুষ শিশু ইংরেজ সৈন্যদের হাতে নিহত হয়। এ সময় মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও পন্ডিত মতিলাল নেহরুর পিতা গোপনে দিল্লী ত্যাগ করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। পূর্বের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি লাল কেল্লার দেওয়ানী খাসে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বাহাদুর শাহের বিচার শুরু করে। চল্লিশ দিন শুনানীর পর ১৮৫৭ সালের ৯ই মার্চ বিচারের সমাপ্তি ঘটে। বিচারের রায়ে বাহাদুর শাহের প্রতি চির নির্বাসনের দন্ডাজ্ঞা প্রদান করা হয়। নির্বাসিত বাহাদুর শাহকে প্রথমে পেগু এবং পরে রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হয়। তিন বছর নির্বাসিত জীবন যাপনের পর ১৮৬১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অযোধ্যায় মৌলভী আহমদউল্লাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয় ৪ঠা জুন ১৮৫৭ সালে। ইতোপূর্বে বিদ্রোহ সংগঠনের প্রস্তুতিকালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেফতার করলে জনগণ তাকে জেল ভেঙ্গে মুক্ত করে। বিদ্রোহীগণ অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলীর নাবালক পুত্র বিরজিস কদরকে বাহাদুর শাহের

অধীনে অযোধ্যর নবাব এবং বেগম হজরত মহলকে তাঁর অভিভাবিকা নিযুক্ত করলে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে মৌলভী আহমদউল্লার অনুসারীদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহু ইংরেজ সৈন্য হতাহত হয়। অতঃপর মৌলভী ছয় হাজার অনুসারীসহ শহর ত্যাগ করেন। ১৮৫৭ সালের ৫ই জুন মৌলভী আহমদউল্লাহ স্বল্প সংখ্যক অনুচরসহ অযোধ্যা-রোহিলা খন্ডের সীমান্তে অবস্থিত পবাইনে গমন করেন। পবাইনের জমিদার রাজা জগন্নাথ প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন। রাজা জগন্নাথ মৌলভীকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে গুলী করে হত্যা করে ব্রিটিশ শাসকগণের কাজ থেকে ৬৫ হাজার টাকা এবং জমিদারী লাভ করেন। বেগম হজরত মহলের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সম্ভবত ইংরেজগণ তাঁকে গুলী করে হত্যা করে। ঝাসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের দত্তকপুত্রের সিংহাসনের দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৮৫৭ সালের জুন মাসে ঝাসীতে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা প্রবল আকার ধারণ করে। ইংরেজ সেনাপতি স্যার রোজের বাহিনীর হাতে পরাজিত রাণী সসৈন্যে গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন। ইংরেজগণ এখানে পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করে। পুনরায় স্যার রোজ কর্তৃক অতর্কিত আক্রান্ত হয়ে এ বীরাঙ্গনা ১৮৫৭ সালে ১৮ই জুন যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁরা ট্রেজারী লুণ্ঠন, কয়েদীদের মুক্তিদান এবং অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্যারাক ত্যাগ করেন। সিলেটের লাটু নামক স্থানে বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধে মেজর বায়ঙ্গ নিহত হন। মনিপুরের তিনটি যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে মনিপুর এবং বার্মা সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় উপস্থিত হন। প্রথমদিকে বিদ্রোহীরা গোলাবারুদের সাহায্যে পশুপাখী শিকার করে ক্ষুন্নি বৃত্তি নিবারণ করে। গোলা বারুদ নিঃশেষ হলে নিজেরাই নরখাদকের শিকারে পরিণত হয় (ওয়ালিউল্লাহ ১৯৬৯)।

১৮৫৭ সালের ৫ই জুন কানপুরের অধিবাসী ও সৈন্যগণ পেশোয়া বাজীরাওয়ের বৃত্তি বঞ্চিত দত্তকপুত্র নানা সাহেবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল হুলারকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। এ সময় দুইশত ইংরেজ

বন্দীকে হত্যা করা হয়। জুলাই মাসে জেনারেল হেভলক পুনরায় কানপুর দখল করলে কয়েক হাজার ভারতীয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গল অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁর সর্বশেষ পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

নানা সাহেবের সেনাপতি তাতিয়া তোপী পুনরায় কানপুর দখল করার পর ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়ে কানপুর ত্যাগ করেন। অতঃপর তাতিয়া গোয়ালিয়র আক্রমণ করে সিন্ধিয়াকে পরাজিত করে তা দখল করেন। ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি গোয়ালিয়র থেকে পলায়ন করেন। অতঃপর আরো কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নরবরের বিশ্বাসঘাতক রাজা মানসিংহের চক্রান্তে ১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল তিনি ব্রিটিশের হাতে ধৃত হন। ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল সিপ্রিতে প্রকাশ্য স্থানে তাতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়। তাঁর প্রাণ বায়ুর সাথে বিদ্রোহেরও প্রাণ বায়ু শূন্যে মিলিয়ে যায় (ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৬৯)।

১৮৫৭ সালের ২২শে নভেম্বর ঢাকার লালবাগে অবস্থিত সেনা ছাউনীর গোলন্দাজ বাহিনীর দেশী সিপাহিদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে লেঃ লুইসের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে টিকতে না পেরে সিপাহিগণ বুড়ীগঙ্গা নদীতে নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঢাকার কাশ্মীরী শাল ব্যবসায়ী এবং জমিদার আবদুল গনি ইংরেজদের কাছে সংবাদ দিয়ে বিদ্রোহিদের ধরিয়ে দিয়ে নবাব উপাধি লাভ করেন। ধৃত সিপাহীদের আন্টাঘরের ময়দানে (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়।

মহাবিদ্রোহের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দেশ মাতৃকাকে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে উদ্ধার করার মহান ব্রত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এ মহাবিদ্রোহে। বিদ্রোহের সূচনালগ্নে মীরাটের হিন্দু ও মুসলমান জনগণ আল্লাহু আকবর ও জয় শম্ভুজী শ্লোগান দিয়ে বিদ্রোহের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বেরিয়ে

এসেছিলো রাস্তায় (ইসলাম, ১৯৭৪)। বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক গো-হত্যা নিষিদ্ধের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহের দুই বছর হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে, মুসলমান হিন্দুর ও হিন্দু মুসলমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছে। একে অন্যের অনুসরণে নিঃশংক চিত্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, একসঙ্গে ঝুলেছে ফাঁসিকাষ্ঠে, একই বন্দুকের গুলীতে উভয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করেছে এবং উভয়েই মিলিত কণ্ঠে বাহাদুর শাহের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে। নসরতপুরের রাজা বেণী বাহাদুর যুদ্ধে ব্রিটিশের হাতে পরাজিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সেনাপতি তাকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। জবাবে বেণী বাহাদুর বলেন, "দুর্গ রক্ষায় যখন আমি অসমর্থ, তখন তাহা আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু আমার দেহের মালিক সম্রাট বাহাদুর শাহ। উহার উপর আমার কোন অধিকার এখন আর নাই" (ওয়ালিউল্লাহ ১৯৬৯)।

ব্যর্থতার কারণসমূহঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ প্রায় দুই বছর চললেও শেষ পর্যন্ত এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন অর্থাৎ উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন কারণে এ মহান সংগ্রাম ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়।

পলাশীর বিজয়ের পরবর্তী একশত বছরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে একটি শক্তিশালী, শোষণ ও নিপীড়নমূলক এবং সুশৃংখল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো সব সময়ই ইংরেজদের দখলে থাকতো। ফলে চরম সংকটের সময় প্রশাসনের নিরংকুশ আনুগত্য লাভে শাসকশ্রেণীর কোনই অসুবিধা হয়নি। বেসামরিক চাকুরীতে নিয়োজিত দেশীয় ব্যক্তিগণ বিদ্রোহের সময় তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন। এটাকে ব্রিটিশ প্রশাসনের কৃতিত্ব বলা যায়। এ সমস্ত দেশপ্রেমবর্জিত কর্মচারী বিপদের সময় লুকিয়ে রেখে, গোপন খবর পাচার করে এবং বিদ্রোহীদের ধরিয়ে দিয়ে তাদের বিজাতীয় প্রভুদের সেবা করেছে অকুণ্ঠভাবে। আলীগড়ের সৈয়দ আহমদ খান চাকুরী রক্ষা ও পদোন্নতির জন্য বিদ্রোহের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

ইংরেজদের প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ। ফলে বিদ্রোহীদের অনেক পরিকল্পনাই আগে ভাগে ফাঁস হয়ে যায়। বিদ্রোহ দমনের

লক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের দখল থেকে কোন এলাকা কব্জা করা মাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সেখানে নির্বিচার হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন সংঘটন করে যাতে অন্যান্য এলাকার লোকজন এতে ভীত হয়ে বিদ্রোহ করতে সাহসী না হয়। ইংরেজদের হাতে দিল্লীর পতনের পর সেখানে একদিনে ২৪জন মুঘল শাহজাদাকে ফাঁসি দেয়া হয়। এলাহাবাদের পতনের পর সেখানে প্রায় ছয় হাজার অধিবাসীকে হত্যা করে তাদের লাশ রাস্তার উভয় পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। ইংরেজ প্রশাসনের এরূপ নজিরবিহীন নৃশংসতার কারণে অনেক স্থানেই জনগণ ভীত হয়ে বিদ্রোহীদের সহযোগিতা বা আশ্রয়দান করতে সাহসী হয়নি। বিদ্রোহী সিপাহিগণ কোন কোন ক্ষেত্রে লুটতরাজ এবং বেসামরিক ইংরেজদের হত্যা করে। ইংরেজ প্রশাসন এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে জনগণের মনে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ঘৃণা সঞ্চারে সচেষ্ট হয় এবং আংশিক সফলতাও লাভ করে। অজ্ঞ নিরীহ জনগণের একাংশ বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ শুরু করে। যদিও বাহাদুর শাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে বিদ্রোহের অবসানে সম্মিলিত রাজন্যমন্ডলীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির প্রশাসন সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করতে থাকে যে এ বিদ্রোহ জয়যুক্ত হলে ভারতবর্ষে পুনরায় ব্রিটিশ পূর্ব যুগের বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হবে। দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে কোম্পানির প্রশাসন রাজা, বাদশাহদের প্রশাসনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিলো। এ অপপ্রচারের ফলে দেশের শিক্ষিত শ্রেণী মধ্যযুগের বিভীষিকাপূর্ণ, অদক্ষ প্রশাসনের প্রত্যাবর্তনের আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণী এ বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকে।

বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর জন্য এক শ্রেণীর লেখককে নিয়োজিত করা হয়। এ বিষয়ে কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের প্রচারণা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের কোন সংগঠিত প্রশাসন ছিলো না। বাহাদুর শাহ বিদ্রোহের প্রতিকী প্রধান ছিলেন মাত্র। কোন কোন বিদ্রোহী নেতার ঔদ্ধত্যের কাছে তিনি ছিলেন অসহায়। বিদ্রোহীদের মাঝে ঐক্যের অভাব ছিলো। অস্ত্রবলের দিক দিয়েও তারা ছিলো হীন। কোম্পানির টোটা বন্দুকের সামনে

বিদ্রোহীদের গাদা বন্দুক টিকতে পারেনি। ব্রিটিশ প্রশাসন প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অগ্রসর ছিলো। ১৮৫৩ সালে ভারতবর্ষে বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত সর্বপ্রথম ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এটা ছিলো কোম্পানির শাসকদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। অধিক সংখ্যক সৈন্য দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়ার জন্য রেলগাড়ী ছিলো অত্যন্ত কার্যকর বাহন। ইতোমধ্যে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রাফ আবিস্কৃত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন বিজ্ঞানের এ নব আবিষ্কারের সুফল পুরোমাত্রায় ভোগ করে। এ বিদ্রোহকে কেই কেউ সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দুই লক্ষ সত্তর হাজার দেশীয় সৈন্যের মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার মহাবিদ্রোহে যোগদান করে। অবশিষ্ট সৈন্যগণ বিদ্রোহে যোগদান করেনি এবং বিদ্রোহ দমনে এদের নৃশংসতা ইংরেজদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না।

উপমহাদেশে ব্রিটিশ কোম্পানি প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ দমনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাদের সহজাত বৈষয়িক বুদ্ধি বলে অনুধাবন করে যে, একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ষোল লক্ষ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট এ বিশাল ভূখন্ড সরাসরি শাসনাধীন আনয়ন ও নিয়ন্ত্রণ বাস্তবসম্মত নয়। ভারত বর্ষের দুই তৃতীয়াংশ সরাসরি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন আনয়ন করা হয়। অবশিষ্ট অংশ প্রায় ছয়শত ছোট বড় দেশীয় রাজার শাসনাধীনে থাকে। এ সমস্ত রাজা ব্রিটিশ শাসকদের আনুগত্য স্বীকার এবং নিজ রাজ্যে ব্রিটিশ প্রতিনিধি রাখার বিনিময়ে সীমিত স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি এ সমস্ত রাজার আনুগত্য ছিলো প্রশ্নাতীত। হায়দারাবাদের নিজাম, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ভূপালের বেগম সাহেবা, পাতৌদীর নবাব, নেপালের রাজা প্রমুখ দেশীয় রাজন্যবর্গ এ মহান সংগ্রামের সময় স্বদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে তাদের বিদেশী প্রভুদের সাহায্য করে এ উপমহাদেশকে আরো একশত বছর পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ রাখতে মদদ যুগিয়েছিলেন।

কেবল অযোধ্যা, মীরাট, রোহিলাখন্ড প্রভৃতি এলাকায় এ সংগ্রাম যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিলো। অযোধ্যার মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের যথাক্রমে

শতকরা ৮০ ও শতকরা ৩৩ ভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ মহান সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যত্র এ অবস্থা ছিলো ভিন্নরূপ। চিরাস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী প্রথার উদ্ভব হয়। নবোত্থিত এ ভূস্বামী শ্রেণী কোম্পানির সমর্থক ও সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিলো স্থায়ী রাজস্বের সংস্থান এবং কোম্পানি-শাসনের প্রতি স্থায়ী সমর্থক শ্রেণী সৃষ্টি করা। সুতরাং কোম্পানির কার্যাবলীর প্রতি ভূস্বামীগণ সমর্থন জানিয়েছেন, কেননা ভূস্বামীগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোম্পানি-শাসনের অবসান ঘটলে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর চূড়ান্ত আঘাত আসতে পারে, এমনকি তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। এ সক্ষম হয় যে, স্থানীয় ভূস্বামীগণ তাদের পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করার কারণ উভয়ের স্বার্থ ছিলো পরিপূরক। এ ভূস্বামী শ্রেণী বিদ্রোহ দমনে কোম্পানির শাসকদের দান করে ব্যাপক সহযোগিতা। এদের মধ্যে ঢাকার আব্দুল গনি, ভাওয়ালের কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী, চট্টগ্রামের কালিন্দী রাণী, যশোরের বরদাকান্ত রায় প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এসব ভূস্বামী কোম্পানি শাসকদের সহযোগিতার বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন।

ফলাফল ঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসন। বিদ্রোহের পূর্ব থেকেই কোম্পানির কুশাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরূপ সমালোচনা চলতে থাকে। ১৮৫৭ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে ভারত শাসনভার ন্যস্ত করে। ব্রিটেনের কেবিনেট মন্ত্রিদের মধ্যে থেকে একজন ভারত সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। ভারত সচিব ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন বলে স্থিরিকৃত হয়। ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্ণর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া হত্যা, লুট প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যতীত অন্যান্য বিদ্রোহীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকল প্রজা তাদের শিক্ষা, সামর্থ্য ও ক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্ম ব্যবস্থায় অবাধে ও নিরপেক্ষভাবে নিযুক্ত হবেন। এ সময় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের দাবী জোরেশোরে উত্থাপিত হতে থাকে এবং ভারতীয়গণ ক্রমেই অধিক সংখ্যায়

সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করতে থাকে। ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ, নির্যাতনে অতীষ্ঠ জনগণের ক্ষোভ যাতে স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ও ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বিদ্রোহ অবসানের পর ইংরেজ শাসকগণ বিদ্রোহী ভূস্বামীদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। যেহেতু মুসলমান ভূস্বামীগণ অধিক সংখ্যায় বিদ্রোহী হয়েছিলেন তাই এ ব্যবস্থার ফলে মুসলমানগণ অধিকতর ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফলে শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে।

মহাবিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ব্রিটিশ শাসকগণ স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করে যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় থাকলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাই তারা 'বিভক্ত করো ও শাসন করো' নীতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়। ব্রিটিশ শাসকগণ কর্তৃক বপণকৃত সাম্প্রদায়িকতার বীজ কালক্রমে পরিণত হয় বিষবৃক্ষে। কখনো হিন্দুর কখনো মুসলমানের হিতৈষী সেজে তারা এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পায় যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ছিলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গা, দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং সর্বশেষে ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ।

উপসংহার ঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। পৃথিবীতে কোন ত্যাগই বৃথা যায় না। বিদ্রোহীদের বীরত্ব অসম সাহস সর্বোপরি নিঃশেষে প্রাণ দান ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এজন্য ইতিহাসে তাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। বিদ্রোহীদের অনেক ত্রুটি, বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা ছিলো। কিন্তু তাদের অবদানকে সেজন্য অস্বীকার করা যায় না। ব্যর্থতাই সাফল্যের সোপানস্বরূপ। এ সংগ্রামের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চলতেই থাকে। এ সংগ্রাম কখনো ছিলো অহিংস আবার কখনো তা সহিংস রূপ ধারণ করে। এ সংগ্রামের সময় স্বদেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে উপমহাদেশের কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মজীবী এবং সামন্তপ্রভু ব্রিটিশ প্রভুদের কৃপাভাজন হলেও মহাকালের অমোঘ বিচারে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লেখা থাকবে চিরদিন। নিজ জন্মভূমিতে শেষ শয্যার জন্য দুই গজ জমি না জোটায় বাহাদুর শাহ জাফর নিজ

সমাধি গাত্রে লিখিত স্বরচিত কবিতায় নিজেকে 'বদনসীব' আখ্যায়িত করেছিলেন। আশির দশকে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বার্মা সফরকালে বাহাদুর শাহের সমাধি গাত্রে উক্ত কবিতার নীচে বাহাদুর শাহকে "খোশনসীব" (সৌভাগ্যবান) সম্বোধন করে লিখেছিলেন যে, তাঁর মহান আত্মত্যাগই স্বাধীনতার শিখা হয়ে দেশকে স্বাধীন করায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশে পরবর্তী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চেতনা অগ্নিমশাল হিসেবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা

ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯৬৯) *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম।* ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯০) *সেই সময়।* কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

কবিরাজ, নরহরি (১৯৮৭) *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা* ঢাকা ঃ বাণী প্রকাশ।

মিত্র, গজেন্দ্র কুমার (১৩৮৪) *রাখাল ও রাজকন্যা।* কলিকাতা ঃ মিত্র এ্যান্ড ঘোষ পাবলিশার্স।

ইসলাম, মোজাহারুল (১৯৭৪) *আমি স্মৃতি, আমি ইতিহাস।* ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

বন্দোপাধ্যায়, অনিল চন্দ্র (১৯৮৬) *ভারতের ইতিহাস।* কলকাতা ঃ এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ।

চৌধুরী, রাহমান (১৯৯৫) *মহাবিদ্রোহ ও সম্রাট বাহাদুর শাহ।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

চক্রবর্তী রতনলাল (১৯৯৩) *সিপাহী বিদ্রোহ* সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস।* ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।

চন্দ্র, বিপিন (১৯৭৮) *আধুনিক ভারত।* কলকাতা ঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

বিশী, প্রথমনাথ (১৩৮৪) লাল কেল্লা। কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

ইসলাম ও অন্যান্য (১৯৮৭) *বাংলাদেশের ইতিহাস।* ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

Marx, Karl and Engels, Frederick (1988) *The First Indian war of Independence.* Hascow : Progress Problemes.

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

বাংলাদেশে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এস, এম, জুবায়ের এনামুল করিম *

Comparative Analysis of Family Welfare Programmers of Bangladesh. S. M. Zobayer Enamul Karim

Abstract : Bangladesh is one of the most densely populated countries of the World. Our resources are scarce compare to the needs of population. Hence, it is very difficult to meet the basic needs of the people and to develop their physical and mental capability. An attempt has been made to analyse the family planning programmers of Bangladesh undertaken and implemented from 1953. Major variables analysed in this paper cover: structure for rendering family planning service, mother & child health care, management for input supply for birth control, information management, monitoring and evaluation process of family planning programme. The analysis reveals strong political commitments by all successive governments, policy consistency of family planning programmes and strategies, supportive attitude of religious leaders, effective coordination among personnel of diverse government agencies and field workers, female education, mass media campaign are the major contributing factors for the success of family planning programmes. The success of the family planning programmes mostly depends on the effective participation of people. Future policies and programmes may be formulated based onthe success learning of the past family planning programmes.

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ঘনবসিতপূর্ণ দেশ। জনসংখ্যার এ বিরাট অংশের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য দেশের প্রশাসনকে প্রতিনিয়ত যথেষ্ট হীম-সীশ খেতে হচ্ছে। কেননা, জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। সম্পদ ও জনসংখ্যার এ ভারসাম্যহীনতার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক ও রাজনৈতিক

* সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

বিশৃংখলা এবং সর্বোপরি প্রত্যাশিত উন্নয়ন দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতা বৈদেশিক নির্ভরতাকে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়ে তুলছে; এ অবস্থা ক্রমাগতভাবে চলতে থাকলে জাতি হিসেবে আমাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একদিন রহিত হবে এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়াও মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও আমাদের প্রচেষ্টা একেবারে কম ছিল না। সরকার এ বিষয়টিকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে, সমাধানের পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করেছে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে পরিকল্পিত পরিবার গঠন তথা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস ও তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাপ্ত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে কয়েকজন দূরদর্শী ও নিবেদিত প্রাণ সমাজসেবকের মহতী প্রচেষ্টায় এদেশে সরকারী পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের সূচনা হয়। এ প্রবন্ধে ১৯৫৩ সাল থেকে অদ্যাবধি সরকারীভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে ১১টি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ পর্যায়গুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ বেসরকারী ক্লিনিকভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৫৩-৬০)

১৯৫৩ সালে কিছু সমাজ সচেতন, প্রগতিশীল ও মানব হিতৈষীদের প্রচেষ্টায় জনসংখ্যা কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত হয় পরিবার পরিকল্পন সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি বড় বড় শহরগুলোতে ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে; জনগণকে অবহিতকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরিবার পরিকল্পনা সমিতি 'সুখী জীবন' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

তৎকালীন সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৫৫-৬০) বেসরকারী উদ্যোগে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৫ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করে (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০)।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ক্লিনিকভিত্তিক সরকারী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৬০-৬৫)

স্বাধীনতাপূর্ব ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তৎকালীন সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩০.৫ মিলিয়ন রূপী বরাদ্দ করে (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০)। এ সময়ে জনসংখ্যা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্য সার্ভিসের অংশ হিসাবে সম্পৃক্ত করা হয় এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, যেমনঃ হাসপাতাল, ডিসপেনসারী এবং ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী হিসেবে শুধু কনডম বিতরণ করা হয়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ মাঠভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৬৫-৭০)

এ কার্যক্রমকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পূর্বকালীন পর্যায় হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। ১৯৬৫ সালে সরকারী পর্যায়ে জোরদারভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং জনসংখ্যা কার্যক্রমের জন্য ১৬৬ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়; কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন করা হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে গঠিত বোর্ডের ওপর সার্বিক কার্যক্রমের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং এ দায়িত্ব একজন পরিচালকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা পর্যায়ে একজন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (স্নাতক ডিগ্রিধারী) এবং ক্লিনিক্যাল সেবা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একজন জেলা টেকনিক্যাল কর্মকর্তা (মেডিক্যাল স্নাতক) নিয়োগ করা হয়। থানা পর্যায়ে একজন থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং একজন মহিলা ও ২জন পুরুষসহ মোট ৩ জন সহকারী নিয়োগ করা হয়। থানা পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়। গ্রাম পর্যায়ে ১৫ টাকা বেতনে স্বেচ্ছাভিত্তিক খন্ডকালীন দাই নিয়োগ করা হয়। তাদের মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিদের উদ্বুদ্ধকরণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়; ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩০ টাকা মাসিক বেতনে স্বেচ্ছাভিত্তিক CMO (Chief Male Organiser) নিয়োগ করা হয়। স্থানীয় হকার, দোকানদার, চৌকিদার ও গ্রাম্য চিকিৎসকদের মধ্য থেকে এদের নির্বাচন করা হয়।

জেলা এবং প্রধান প্রধান মহকুমা শহরে Urban Clinic খোলা হয়। সেখানে একজন মহিলা আরবান কাউন্সিলার ও একজন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হয়, মহিলা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা নামে একটি নতুন প্যারামেডিকস ক্যাডার গঠন করা হয়, তাদেরকে আই ইউ সি ডি এবং খাবার বড়ির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; এ সময়ে প্রচারকার্য জোরদার করা হয়।

এ পর্যায়ে স্থূল জন্মহার ৫০ থেকে কমিয়ে ৪০-এ, মৃত্যুহার ২০ থেকে কমিয়ে ১৫তে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় এ সময়ে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ছিল ৩.৭ (National Impact Survey) স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ১৯৭১ সালে কার্যক্রম প্রায় বন্ধ থাকে (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০)।

চতুর্থ পর্যায় ঃ অন্তর্বর্তীকালীন সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (১৯৭২-৭৪)

এ পর্যায় থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম। বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত থাকায় স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন বিলম্বিত হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে ও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আলাদাভাবে পরিচালিত তিনটি Vertical Programme, যথাঃ স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া নির্মূল ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে একীভূত করে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করা হয়; এ পর্যায়ে কর্মসূচির কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।

জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধিকে দেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা দেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপরিমিত গতিকে কার্যকরভাবে রোধকল্পে প্রক্রিয়াধীন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি শক্তিশালী জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন, একটি স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো গঠন এবং

পরিবার পরিকল্পনা সেবার সাথে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্পৃক্ত করাসহ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করার বিষয়েও সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি সাবেক সরকারের অবকাঠামো নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ ও আইইউডি প্রয়োগের আর্থিক সুবিধা (incentives) অবলুপ্ত করা হয় এবং পঞ্চাশ শতাংশ ধাত্রী ও পুরুষ সংগঠন ছাটাই করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত মহিলাদের পুনর্বাসন ও এম আর কর্মসূচি চালু করা হয়। স্বাস্থ্য ও ম্যালেরিয়া কার্যক্রমে নিয়োজিত ১২০০০ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমন্বিত সেবাদান কার্যক্রমে নিয়োজিত করা হয় এবং জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্বে স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ গঠন করা হয়। এই সময় দেশের ৩টি জেলায় (বৃহত্তর নোয়াখালী, খুলনা এবং টাংগাইল) পরীক্ষামূলকভাবে 'Motivator' নামে সার্বক্ষণিক মাঠকর্মী নিয়োগ করা হয় (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০)। এ পর্যায়ে কর্মসূচীর কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।

পঞ্চম পর্যায়ঃ মা ও শিশু স্বাস্থ্যভিত্তিক বহুমুখী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৭৫-৭৮)

উপ-রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে ১৯৭৫ সালে গঠিত হয় প্রথম জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ। ১৯৭৫ সালে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ পুর্নগঠিত হয় এবং ১৯৭৬ সালে মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয়-স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা

বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য দুজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। দুটি বিভাগ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯৭৭ সালের শেষ দিক পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৬ সালে পূর্ণকালীন মাঠকর্মী নিয়োগ করা হয়। প্রতি গ্রামে একজন দাইকে নিরাপদ প্রসবের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়, ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট) সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৮ সালের শেষদিক থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত 'Two Years Approach Plan' চালু করা হয়। এই পরিকল্পনায় আওতায় মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগকে সমন্বিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়।

এই সময়কালে জনমিতিক লক্ষ্যমাত্রায় স্থুল জন্মহার ৪৭ থেকে কমিয়ে ৪৩, স্থুল মৃত্যুহার ১৭ থেকে কমিয়ে ১৫, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩% থেকে কমিয়ে ২.৮%-এ এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ NRR-1 অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন জরীপে দেখা যায় এ সময়ে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭% এ (BFS-75) উন্নীত হয় (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০, BBS, ১৯৭৮)

ষষ্ঠ পর্যায় ঃ থানা ও নিম্ন পর্যায়ে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন (১৯৭৮-৮০)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) মেয়াদান্তে দু'বছর মেয়াদী (১৯৭৮-৮০) 'Two Years Approach Plan' গ্রহণ করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলঃ পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় থানা ও নিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন। এ সময়কালে গৃহীত প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ ঃ

মহাপরিচালক (কর্মসূচী উন্নয়ন)- এর একটি নতুন পদ সৃষ্টি এবং পূরণ করা হয়;

বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক ও জেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক (সাধারণ ও আইইএম) ও সহকারী পরিচালক (এমসিএইচ) পদ সৃষ্টি ও পূরণ করা হয়;

থানা ও নিম্ন পর্যায়ে থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করা হয়;

স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব দু'জন সচিবের স্থলে একজন সচিবের উপর ন্যস্ত করা হয়।

এ পর্যায়ে বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭% এ নেমে আসে এবং প্রজনন হার দাঁড়ায় ৬.৫৭% (CPS-79)। পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার এ সময়ে ১২.৭ (CPS-79) এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৯)।

সপ্তম পর্যায় ঃ সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৮০-৮৫)

সমন্বিত কার্যক্রমের আওতায় থানা ও নিম্ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান মেডিক্যাল অফিসারসহ স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

একক নেতৃত্ব (Unified Command) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং এই মন্ত্রণালয়ে এক মন্ত্রী ও এক সচিবের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় থানা ও নিম্ন পর্যায়ে Coordinated Service Delivery System চালু করা হয়।

মহাপরিচালক ও মেডিক্যাল অফিসার (ভ্রাম্যমাণ বন্ধ্যাকরণ দলগুলি) অবলুপ্ত হয়, থানা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়কে থানা পরিষদ কার্যালয় থেকে থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়; উপজেলা পদ্ধতি চালু করা হলে পরিবার পরিকল্পনা প্রশাসনকে উপজেলা পরিষদ প্রশাসনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

এ পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল স্থুল জন্মহার ৪৩ থেকে কমিয়ে ৩২-এ, স্থুল মৃত্যুহার ১৭ থেকে কমিয়ে ১৪তে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ২.৭ থেকে কমিয়ে ১.৮-এ এবং পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৪ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৮ এ উন্নীত করা। এছাড়াও, ১৯৯০. সাল নাগাদ NRR-1 অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার এ সময়ে ছিল ২.২২%-এ। স্থুলজন্ম ও মৃত্যুহার যথাক্রমে ৩৪.৬ ও ১২.০ তে নেমে এসেছে। এ সময়ে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর

হার ২৫.৩%-এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ সরকার ২০০০)। স্থূল জন্ম ও মৃত্যুহার যথেষ্ট কমে আসার অন্যতম কারণ হয়তোবা সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের জন্য সম্ভব হয়েছিল। এসময়ে সরকার কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য এতদসংক্রান্ত দুটি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে এবং বিভিন্ন সমাজকর্মীদের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে ও প্রশাসনিক সংস্কারের ব্যবস্থাও এসময়ে গ্রহণ করা হয়।

অষ্টম পর্যায় ঃ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৮৫-৯০)
জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ সময়ে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় ইউনিয়ন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি;

থানা পর্যায়ে সাংসদদের সভাপতিত্বে গঠিত হয় থানা 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি';

উপজেলা চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি';

জেলা পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়। 'জেলা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত হয় জেলা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি' এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি';

কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদল, সকল মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, যুগ্ম-সচিব এবং সাংসদদের মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম তদারকীতে সম্পৃক্ত করা হয়;

সেবা প্রদান অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়ন ও বিস্তারকরণ জোরদার করা হয়;

সুষ্ঠুভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ে এফডব্লিউএ (FWA) রেজিষ্টার প্রবর্তন করা হয়;

মাঠ পর্যায়ে সেবার প্রাপ্যতাকে আরো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়;

বহুমুখী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কার্যক্রম জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী প্রথম বারের মত জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয় এবং প্রতি বছর দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়;

জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের কলেরব বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রতি তিনমাস অন্তর পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়;

বেসরকারী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ জোরদার করা হয়;

দুসন্তান বিশিষ্ট আদর্শ দম্পতিদের সম্বর্ধনা দেওয়ার রীতি প্রচলন করা হয়;

ভালো কাজের জন্য মাঠকর্মীদের পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়;

সেবার মান উন্নত করার প্রয়াস নেওয়া হয়;

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়;

এ সময়ে বাংলাদেশের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ পর্যায়ে স্থুল জন্মহার ৩৯ থেকে কমিয়ে ৩১ এ, স্থুলমৃত্যুহার ১৫ থেকে কমিয়ে ১৩.৪ এ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ২.৪ থেকে কমিয়ে ১.৮-এ, প্রজনন হার ৫.৬ থেকে কমিয়ে ৪.১-এ, শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ১২৫ থেকে কমিয়ে ১১০-এ, মাতৃমুত্য হার ৬ থেকে কমিয়ে ৪-এ, নবজাতক-শিশুমৃত্যু হার ৮৫ থেকে কমিয়ে ৬৫-তে (প্রতি হাজারে) এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার শতকরা ২৫.৩% ভাগ থেকে ৪০% ভাগে উন্নীত করাসহ ২০০০ সাল নাগাদ NRR-1 অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)। বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এ পর্যায়ে কমে ২.১১%এ, স্থুল জন্মহার ৩৪.৫এ, স্থুল মৃত্যুহার ১৩.৪এ, প্রজনন হার ৪.৩ এ, শিশুমৃত্যু হার ১১০ জনে (প্রতি হাজারে) এবং সন্তান কামনার গড় ৪.১ থেকে কমে ২.৯ এ হ্রাস পায় (আক্তারুজ্জামন, ২০০০)। সরকারীভাবে দৃঢ় অঙ্গীকার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রমের ধনাত্মক ফলাফল দেখা যায় বলে ধারণা করা হয়।

নবম পর্যায় ঃ নিবিড় সেবাদান পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৯০-৯৫)

এ সময়কালে কার্যক্রমকে আরো ব্যাপকভিত্তিক ও চাহিদা উপযোগী করে সাজানো হয় এবং মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান অবকাঠামো বিস্তারকরণ অব্যাহত থাকে। মাঠকর্মীদের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং কাউন্সেলিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। মা ও শিশুর মৃত্যুরোধে জরুরী প্রসূতি সেবার প্রচলন করা হয় এবং নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক কার্যক্রম জোরদার করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসাবে স্বল্পপরিসরে নরপ্লান্ট পদ্ধতির প্রচলন করা হয় এবং পরিবার কল্যাণ-সহকারীদের মাধ্যমে বাড়ীতে ক্লায়েন্টকে (ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি) ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্ধ্যাকরণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ কেন্দ্র খোলা হয়। পুরুষদের এবং নবদম্পতিদের পদ্ধতিগ্রহীতা হিসেবে উদ্বুদ্ধকরণের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়। ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল পদ্ধতির গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন টীমের কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয়।

এ পর্যায়ে জনমিতিক লক্ষ্যমাত্রায় স্থুল জন্মহার ৩৭.৫ থেকে কমিয়ে ৩০.১-এ, স্থুল মৃত্যুহার ১৩.৪ থেকে কমিয়ে ১১.৯-এ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৬ থেকে কমিয়ে ১.৮ এ, প্রজনন হার ৪.৩ থেকে কমিয়ে ৩.৪-এ, শিশুমৃত্যু হার ১১০ (প্রতি হাজারে) থেকে কমিয়ে ৮০তে, মাতৃ মৃত্যুহার ৫.৭ থেকে কমিয়ে ৪.৫ এ এবং পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার শতকরা ৩৯.২% থেকে ৫০%-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

বিভিন্ন জরিপে এ পর্যায়ে অর্জিত অগ্রগতিতে দেখা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এ সময়ে ১.৮১%-এ (BBS-95) এবং প্রজনন হার ৩.৭-এ নেমে আসে। এ সময়ে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬%-এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ সরকার ২০০০)।

দশম পর্যায়ঃ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের প্রস্তুতিকাল (১৯৯৫-১৯৯৮)

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক

সম্মেলন (ICPD)। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশের আলোকে জনসংখ্যা কার্যক্রমকে প্রজননস্বাস্থ্য পরিচর্যাভিত্তিক করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ সময়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদের জন্য নতুন আঙ্গিকে কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রজননস্বাস্থ্য পরিচর্যার সকল উপাদানকে সম্পৃক্ত এবং সেবা প্রদানের নতুন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

একাদশ পর্যায়ঃ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম-৫ (১৯৯৮-২০০৩)

এ সময়ের জন্য ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের এ কৌশল অর্থাৎ Health and Population Sector Strategy ইতোমধ্যেই সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। এ কৌশলের ভিত্তিতে ১৯৯৮ এর জুলাই মাস থেকে ৫ বছর মেয়াদী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম-(HAPP-5) বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকার কর্তৃক গ্রহীত Health and Population Sector Srategy-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলোঃ ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে ২০০৫ সালের মধ্যে NRR-1 অর্জন ও জনউর্বরতা অর্থাৎ মহিলাদের গড় সন্তান ধারণ ক্ষমতা হ্রাসকরণ (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮)। এ লক্ষ্যে আগামী পরিবার পরিকল্পনা রূপরেখায় প্রস্তাবিত "অত্যাবশ্যকীয় সেবাদান প্যাকেজের" আওতায় পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বর্তমানের দুর্বলতাসমূহকে চিহ্নিত করে সেবাদানের কৌশল, মাত্রা ও মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এক প্যাকেজ কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে।

HAPP-5-এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

জনউর্বরাত ও মৃত্যুহার কমিয়ে আনার জোরদার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

শিশু এবং মাতৃমৃত্যু ও রোগ-ব্যাধি হ্রাস করা;

মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া সংক্রামক ব্যাধিসমূহের প্রকোপ হ্রাস করা।

HAPP-5-এর মূলদিকসমূহ

অত্যাবশ্যকীয় সেবা ব্যবস্থাঃ উচ্চ গুণসম্পন্ন, ক্লায়েন্ট-কেন্দ্রিক, গ্রহীতার-গুরুত্ব নির্ভর, কার্যকর এবং দক্ষ সেবাদান;

গ্রহীতার পছন্দানুযায়ী একই স্থানে সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা;

ফলাফলের ওপর গুরুত্বারোপ এবং পরিবীক্ষণ সূচকের ব্যবহার;

সামাজিক অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ;

ব্যয়-সাশ্রয় এবং দক্ষতা;

কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদী ধারণযোগ্যতা;

সরবরাহ বিকেন্দ্রীকরণসহ বেসরকারী ও ব্যক্তিগত খাতের অংশগ্রহণ;

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে মনোযোগ বৃদ্ধিকরণ;

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।

অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ইএসপি)

১। প্রজননস্বাস্থ্য ঃ পরিবার পরিকল্পনা ঃ ক্লিনিক্যাল এবং নন-ক্লিনিক্যাল, প্রসব-পূর্ব পরিচর্যা, প্রসব-পরববর্তী পরিচর্যা, নিরাপদ প্রসব, টিটি, আরটিআই/ এসটিডি, এইচআইভি/এইড্স তথ্য, গর্ভপাত পরববর্তী জটিলতা ব্যবস্থাপনা এবং জন্মরোধ, বন্ধ্যাত্ব এবং মায়ের পুষ্টি।

২। শিশুস্বাস্থ্য ঃ শিশুর রোগ-প্রতিরোধক টিকা, এআরআই প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ, ডায়রিয়া প্রতিবোধক এবং নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন-এ ঘাটতিপূরণ, হাম নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা, অপুষ্টিপ্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ, আয়োডিনের ঘাটতিপূরণ এবং শিশুর অসুস্থতা দূরীকরণে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিকে শিশু স্বাস্থ্য সেবার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম হিসেবে গণ করা হয়।

৩। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ যক্ষ্মা, মালেরিয়া এবং কুষ্ঠ ও কালাজ্বর প্রভৃতি এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪। রোগ নিরাময় পরিচর্যা

৫। আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (BCC) এবং তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (IEC)।

ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ

নবদম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করাঃ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি বছর দেশে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ বিয়ে হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা বিয়ের প্রথম বছরেই সন্তান ধারণ করেন। এদের বেশীর ভাগেরই বয়স ২০ এর নীচে। অথচ ২০ বছরের আগে সন্তান ধারণ ও জন্মদান মা ও শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নববিবাহিত দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর আওতায় আনতে পারলে যেমন মা ও শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে তেমনি অবাঞ্ছিত জন্মরোধ করা সম্ভব হবে–যা দুসন্তানের সার্বজনীন পরিবার কাঠামো গঠনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

কম বয়সী ও কম সন্তানের দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাঃ দেশে বর্তমানে ১ কোটি ১৮ লক্ষ সক্ষম দম্পতি পদ্ধতি ব্যবহার করছেন (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)। এদের মধ্যে বেশীর ভাগের বয়স ত্রিশ উর্ধ্ব এবং সন্তান সংখ্যা দুয়ের বেশী। তাই কম বয়সী এবং কম সন্তান সংখ্যা বিশিষ্ট দম্পতিদের পদ্ধতি ব্যবহারের আওতায় আনার বিষয়ে গুরুত্বরোপ করা হচ্ছে।

অপূর্ণ চাহিদা পূরণ ঃ ১৯৯৬-৯৭ সালে অনুষ্ঠিত এক জরিপে দেখা গেছে, দেশে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে ১৬ শতাংশের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে তাদের কাছে সেবা পৌঁছায় না। এ দম্পতিদের চিহ্নিত করে দ্রুত পদ্ধতি ব্যবহারের আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ড্রপ আউট ঃ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, সঠিক পরামর্শ প্রদানের অপ্রতুলতা, গুজব ও বিভিন্ন কারণে অনেক সময় পদ্ধতি ব্যবহারকারীগণ পদ্ধতি ব্যবহার ছেড়ে দেন, তাই ড্রপআউট ক্লায়েন্টের পদ্ধতি ছেড়ে দেওয়ার কারণ চিহ্নিত করে তার সমস্যা

সমাধানের সহায়তা করে পরামর্শদানের মাধ্যমে পুনরায় গ্রহীতা করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সেবার মান উন্নয়ন ঃ সেবার মান উন্নয়ন ও বিদ্যমান সেবা ব্যবস্থার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং জনগণকে সেবা গ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।

পুরুষদের পদ্ধতি ব্যবহারকারী হিসেবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ঃ ছোট ও সুখী পরিবার গড়া এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ভয়াবহ পরিণতি থেকে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রধানত মহিলারাই বহন করছেন, কারণ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতাদের মধ্যে মাত্র ১০ ভাগ হচ্ছে পুরুষ; পুরুষদের জন্য পদ্ধতি মাত্র দুটি হলেও পুরুষ পদ্ধতি মহিলাদের পদ্ধতি অপেক্ষা সহজ ও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া মুক্ত। তাই পুরুষরা পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের স্ত্রীকে গর্ভধারণের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে পারেন সহজেই। এ কারণেই পুরুষদের পদ্ধতি গ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং ছোট পরিবার গঠনে সরাসরি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে আগ্রহী করার বিষয়টি জোরদার করা হচ্ছে।

বিলম্ব বিবাহ ঃ যুবক-যুবতীদের বিলম্ব বিবাহের প্রতি আগ্রহী করা হচ্ছে। বিলম্ব বিবাহের ফলে অনেক জন্মরোধ করা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র বিলম্ব বিবাহের কারণে ১৯৭১-১৯৯১ সালের মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ জন্মরোধ করা সম্ভব হয়েছে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

স্বল্প অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় কার্যক্রমে জোরদার করাঃ দেশের ছয়টি বিভাগের মধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম, এই দুটি বিভাগে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে নতুন মাত্রা যোগ হবে। তাই নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ও সেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদার করার প্রতি গুরুত্বরোপ করা হচ্ছে।

মেয়ে শিশু ও মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। বস্তি এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ ও সেবা প্রদান কর্মসূচি জোরদার করা। মাঠকর্মীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন। জন্মরোধ ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির

অন্যান্য কল্যাণকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করা, যেমন ঃ পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুর জীবন বাঁচায়; পরিবার পরিকল্পনা প্রতিটি দম্পতির অধিকার ইত্যাদি।

কার্যক্রমের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা ঃ আগামীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সক্ষম দম্পতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। এদের শতকরা ৭০ ভাগ দম্পতিকে সেবা ব্যবস্থার আওতায় আনা ও সেবা প্রাদন অব্যাহত রাখার জন্য যে বাড়তি সম্পদের প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করার বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বৈদেশিক নির্ভরতা ক্রমে হ্রাস করে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবার বর্তমান অবকাঠামো

বাংলাদেশের সরকারী পর্যায়ের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ১৯৬৫-১৯৯৮ এই দীর্ঘ ৩৩ বছরে পথ পরিক্রমণ করে বর্তমানে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমণে কর্মসূচিকে বার বার প্রয়োজন ও চাহিদার উপযোগী করে সাজানো হয়েছে। পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সেবা অবকাঠামোর বিস্তার এবং মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৩০ হাজার মহিলা মাঠকর্মীর নিয়োগ জনগণের মাঝে সেবাকে সহজলভ্য করেছে যা কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায় নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

জেলা পর্যায় ঃ জেলা পর্যায়ে রয়েছে হাসপাতাল। এ ছাড়া ৫৫টি জেলা সদরে রয়েছে মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র। এর ২৯টি জেলায় মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং জরুরী প্রসূতি পরিচর্যা সেবা চালু করা হয়েছে।

থানা পর্যায় ঃ প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে "পরিবার এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য ইউনিট" রয়েছে। এছাড়াও ১১টি থানায় রয়েছে মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র।

ইউনিয়ন পর্যায় ঃ দেশের প্রায় ৩২০০ ইউনিয়নে "ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ কেন্দ্র" নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে কেন্দ্র নির্মিত হয়নি, সেখানে ভাড়া বাড়ীতে বা রুর‍্যাল ডিসপেনসারির মাধ্যমে সেবা দেওয়া হয়। এসব কেন্দ্রে একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, একজন চিকিৎসা সহকারীসহ আরও কয়েকজন কর্মী জনগণকে সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছেন। এসব কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ সাধারণ রোগের চিকিৎসা এবং পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সকাল ১০টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত এ সকল কেন্দ্র খোলা থাকে। জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার রোগীকে এসব কেন্দ্র থেকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া ২৪টি ইউনিয়ন রয়েছে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র। দেশে বর্তমানে প্রায় ৫ হাজার পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কাজ করছেন।

ইউনিট পর্যায় ঃ একটি ইউনিয়নকে লোকসংখ্যা অনুসারে ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী ৫০০ থেকে ১০০০ সক্ষম দম্পতিকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও পাশাপাশি সেবা প্রদান করছেন।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ সম্প্রতি ইউনিয়নে মাসে ৮টি করে স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি ইউনিয়নকে ৩টি সমান ভাগে ভাগ করে যে ভাগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে সে ভাগে মাসে ২টি এবং অন্য ২টি ভাগে ৩টি হিসাবে ৬টি অর্থাৎ মোট ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এলাকার কোন বাড়ী, স্কুল বা সুবিধাজনক স্থানে এই স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সকল ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, গর্ভবর্তী মাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং শিশুদের টিকা দেওয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানে স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী মাঠকর্মী

পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ঃ এদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। এরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সোব প্রদানের দায়িত্ব পালন করছেন। এরা সকলেই মহিলা মাঠকর্মী।

পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ঃ দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে রয়েছেন একজন করে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক। এদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। ওয়ার্ড পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারীদের কাজের তদারকী করা এবং পুরুষদের পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই এদের মূল দায়িত্ব। এরা সকলেই পুরুষ মাঠকর্মী।

পরিবার কল্যাণ সহকারী ঃ দেশে বর্তমানে সাড়ে ১৩ হাজার পরিবার কল্যাণ সহকারী রয়েছেন, এসকল মাঠকর্মী বাড়ী বাড়ী গিয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং সেবা দিচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ধাত্রী ঃ মা ও শিশুর অকাল মৃত্যুরাধ করার জন্য নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে একজন করে ধাত্রীকে নিরাপদ ও বিজ্ঞান সম্মত প্রসব ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার ধাত্রীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে এবং তাদের নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বলিত কীট (Safe delivery kit) সরবরাহ করা হয়েছে।

সেবার ধরন

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা কেন্দ্র এবং সেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করা হয়ঃ

ক) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সক্ষম দম্পতিদের এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে মায়েদের উদ্বুদ্ধকরণ;

খ) সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবা প্রদান;

গ) গর্ভবর্তী, প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা; এবং

ঘ) নবজাতক ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

পরিবার পরিকল্পনা গর্ভনিরোধক উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা

পরিবার পরিকল্পনা সার্বিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে গর্ভনিরোধক উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা। সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থার উপর কার্যক্রমের অগ্রগতি

অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সময়মত গর্ভনিরোধক উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় গর্ভনিরোধক সামগ্রী বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ও ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় সংগ্রহ করা হয়। বন্ধ্যাকরণের কিছু সামগ্রী স্থানীয়ভঅবে সংগ্রহ করা হয় এবং সকল দ্রব্যসামগ্রী কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে সংরক্ষণ করা হয়। বিদেশ থেকে দ্রব্য-সামগ্রীর বেশিরভাগ সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস হওয়ার পর তা চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পণ্যাগারে জমা হয় এবং পরবর্তীতে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে স্থানান্তর করা হয়। বিমানযোগে আসা পণ্য ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে জমা হয়। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে সংগৃহীত সকল গর্ভনিরোধক সামগ্রী তিনটি বিভাগে অবস্থিত তিনটি আঞ্চলিক পণ্যাগারে, ১৮টি জেলা সংরক্ষণ পণ্যাগারে এবং ৪৬৭টি থানা ষ্টোরে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল ষ্টোর থেকে চাহিদা মোতাবেক এবং যথাসময়ে গর্ভনিরোধক উপকরণ মাঠপর্যায়ে কর্মরত এফ ডব্লিউ এ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে উপকরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চাহিদা এবং বিতরণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হলে তা অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে, আবার চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত সরবরাহ করা হলে অপচয় হবে বা অন্য জায়গায় ঘাটতি সৃষ্টি করবে। উপকরণের সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থার পাশাপাশি সংরক্ষণ ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্রীয় পণ্যাগার থেকে মাঠকর্মী পর্যন্ত সামগ্রী পৌঁছানোর যে পাঁচটি স্তর আছে এবং প্রতিটি স্তরেই চলতি মজুদ হিসেবে ৩ (তিন) মাসের গর্ভনিরোধক উপকরণ মজুদ রাখার বিধান রয়েছে। কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরবরাহ এবং মজুদের প্রতিটি স্তরেই মালামালের প্রাপ্তি, বিতরণ, ব্যবহারের মেয়াদ ও উপযুক্ততা বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

তথ্য ব্যবস্থাপনা

মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য সুষ্ঠুভাবে

সংরক্ষণের জন্য পরিবার কল্যাণ রেজিষ্টার-এর প্রবর্তন করা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ সহকারী বাড়ী বাড়ী পরিদর্শনের সময় রেজিস্টার সাথে নেন এবং লিপিবদ্ধ করেন। এ রেজিস্টারে দম্পতির পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, সন্তান সংখ্যা, সন্তানের জন্ম-মৃত্যু, ব্যবহৃত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির নাম, ব্যবহারের মেয়াদ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রেও পরিবার পরিদর্শিকা এসব তথ্য লিপিবদ্ধ করেন এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তাদের কাজের অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে পেশ করেন। এভাবে অগ্রগতির প্রতিবেদন ইউনিয়ন থেকে থানা, থানা থেকে জেলা, জেলা থেকে অধিদপ্তরের এম আই এস ইউনিটে প্রেরণ করা হয়।

এমআইএস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম) ইউনিট প্রতিমাসে সরকারী, বেসরকারী, সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী এবং বহুমুখী সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত সেবা প্রদানের প্রতিবেদন সংকলন ও প্রণয়ন করে থাকে। এ প্রতিবেদনে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পদ্ধতি ভিত্তিক গ্রহণকারী ও ব্যবহাকরারী সংখ্যা; বয়স ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণকারী ও ব্যবহাকারীর সংখ্যা এবং ড্রপ-আউট বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে তদারকি দল নিয়মিতভাবে মাঠ পরিদর্শন করে থাকেন। পরিবীক্ষণদল সাম্প্রতিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদনের মান এবং সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করে থাকেন (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য

নিরক্ষরতার উচ্চহার, জীবনমান সম্পর্কে অসচেতনতা, দারিদ্র্য, মেয়েদের নিম্ন মর্যাদা প্রভৃতি প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশে পরিবার

পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। অর্জিত সাফল্যগুলো হচ্ছেঃ

- ১৯৭৫ থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি বছর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী শতকরা গড়ে ২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার ১৯৭০ এর ৩ ভাগ থেকে ১৯৯৮-এ ১.৬-এ নেমে এসেছে (বিবিএস ১৯৯৬-৯৭);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতা হার ১৯৭৫-এর ৭ ভাগ থেকে ১৯৯৮ সনে প্রায় ৫০ ভাগে উন্নীত হয়েছে;
- প্রজনন হার বা মহিলা প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার মধ্য ৭০ দশকের ৬.৩ থেকে ১৯৯৭ সনে ৩.৩-এ হ্রাস পেয়েছে।
- কাঙ্ক্ষিত সন্তান সংখ্যা ১৯৭৫ এর ৪.১ থেকে ১৯৯১ সে ২.৫-এ নেমে এসেছে;
- নবজাতকের মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে) ১৯৭৫-এর ১৫০ থেকে ১৯৯৭-এ ৭২-এ নেমে এসেছে;
- অপূর্ণ চাহিদা (Unmet need) ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৯ শতাংশ যা বর্তমানে ১৬ শতাংশে নেমে এসেছে;
- মাতৃ মৃত্যুহার ১৯৮২ এর ৬.২ থেকে ১৯৯৩-এ ৪.২ নেমে এসেছে;
- সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে অবহিতির হার প্রায় একশত ভাগ;
- প্রবল সামাজিক এবং ধর্মীয় বাধা হ্রাস;
- ঝুঁকিপূর্ণ জন্মদানের সংখ্যা কমে যাওয়ার এক হিসেবে দেখা গেছে, ১৯৭১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ২৮ লক্ষ শিশু মৃত্যু এবং ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার মায়ের মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং ১ কোটি ৬০ লক্ষ জন্মরোধ করা সম্ভব হয়েছে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

কর্মসূচির সম্ভাবনাময় সাফল্যে শক্তি ও ক্ষেত্রসমূহ

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আগামী

দশকে সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেশে ইতোমধ্যে সৃষ্ট সেবা অবকাঠামো, বিদ্যামন জনবল ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানসমূহ ভবিষ্যত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইংগিত বহন করে। যেমন ঃ

ক) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের (কর্মসূচির প্রতি) সমর্থনঃ জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অঙ্গীকার রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য রয়েছে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থনের ফলে কর্মসূচির প্রতি বিভিন্ন বাধা প্রায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। এটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনুকূল পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করেছে;

খ) মাঠ পর্যায়ে কর্মী ঃ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর জন্য দেশব্যাপী থানা ও গ্রাম পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক মাঠকর্মী রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রায় ৪৫ হাজার মাঠকর্মী বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছে;

গ) জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক সেবা অবকাঠামো ঃ জেলা পর্যায়ে মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, থানা পর্যায়ে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং রুরাল ডিসপেনসারি ও ভাড়া করা ক্লিনিক সেবাদানের স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান। তাছাড়া, সারা দেশে প্রতি মাসে ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক কাজ করছে। এভাবে দেশে স্থায়ীভাবে প্রায় ৩৫ হাজার সেবা কেন্দ্র থেকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

ঘ) ক্রমবর্ধমান তুষ্ট (Satisfied) গ্রহীতা ঃ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের সাথে সাথে দেশে তুষ্ট গ্রহীতার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে;

ঙ) সমাজ নেতাদের সমর্থন ঃ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সমাজ নেতাদের সমর্থন ও সংগঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন;

চ) মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ঃ স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীগণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা তথা পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও

শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করেছে, তবে এ সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে;

ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় কার্যক্রম ঃ জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা বিবেচনা করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন ঃ তথ্য মন্ত্রণালয় তাদের আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের দ্বারা উপযোগী জনসংখ্যা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা জাতীয় কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করছে;

জ) দাতা সংস্থা বা উন্নয়ন অংশীদারদের সমর্থন ঃ কর্মসূচির সফলতার কারণে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা তথা উন্নয়ন অংশীদারদের জোরালো সমর্থন অব্যাহত রয়েছে।

কার্যক্রমের অধিকতর অগ্রগতির জন্য অন্যান্য সহায়ক ক্ষেত্রসমূহ

পরিবার পরিকল্পনার প্রতি দ্রুত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রজনন বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। দেশে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ কর্মসূচী, মহিলাদের অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হবে। শিক্ষার সুযোগ মেয়েদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের সচেতন করবে এবং বাল্য বিবাহ রোধে সহায়ক হবে। এসকল যোগ্যতা নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবার ও সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে- যা প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিকেও নিম্নমুখী করবে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে দেশে ব্যাপক প্রচারণার কাজ চলছে, মাঠকর্মীরাও পরামর্শ দেওয়ার সময় মায়েদের এ বিষয়ে সচেতন করার কাজ করছেন। সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে গর্ভধারণের আশংকা কম থাকে; এ জন্য সন্তানের বয়স ২ বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ালে অনেক জন্মরোধ করা সম্ভব হবে।

পুষ্টি বিষয়েও দেশে সচেতনতা সৃষ্টির জোরদার প্রয়াস চলছে। পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণ মা ও শিশুকে সবল রেখে তাদেরকে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে রক্ষা করবে।

শিশুর বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা, অধিক সন্তান আকাঙ্ক্ষা ও অধিক সন্তান জন্মগ্রহণের হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ফলে ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক ফলাফল

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব বেশ কিছু সংখ্যক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। প্রজনন হারের ওপর পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রভাবের ফলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হার কমিয়ে এনে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। মোট প্রজনন হার ১৯৭২ সালের পর্যায়ে যদি ৬.৩-এ স্থির থাকত, তাহলে ১৯৯৪ সালে খাদ্যের ঘাটতি ১৬ লক্ষ টনের স্থলে ৪৪ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়াত। একইভাবে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধিহার বার্ষিক ২.৪০ এর স্থলে ০.৫১-এ স্থির থাকত (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

ব্যয় ও লাভের অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, পরিবার পরিকল্পনা খাতে প্রতি ১০০ টাকা বিনিয়োগ করে অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫.০০ টাকা বিনিয়োগজনিত সাশ্রয় পাওয়া সম্ভব এবং এই সাশ্রয় অন্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে সে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের মান বৃদ্ধি করা সম্ভব; এর ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে দাতাসংস্থার ওপর নির্ভরশীলতাও বহুলাংশে কমানো সম্ভব। অন্য কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে এ ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। অভিখাতসমূহ (Interventions) জোরদার করে ২০০৫ সাল নাগাদ মোট প্রজননহার ২.২ অর্জন করা সম্ভব হলে প্রতি ১০ জন পূর্ণবয়স্ক কর্মক্ষম লোকের উপর নির্ভরশীল সন্তানের বর্তমান সংখ্যা ৭ থেকে ৪-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং কেবলমাত্র স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ এবং গৃহায়ন খাতেই ৪৯.০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সাশ্রয় অর্জন করা সম্ভব হবে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম সাফল্যের কারণসমূহ

সাফল্যের পেছনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হচ্ছে ঃ

(১) বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে-এক নম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা;

(২) সরকারী প্রচার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা;

(৩) এ কার্যক্রমের প্রতি অব্যাহত সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার;

(৪) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সেবা অবকাঠামো নির্মাণ;

(৫) বিশাল মাঠকর্মীদের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সক্ষম দম্পতিদের ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা;

(৬) সেবা গ্রহীতাদের নিকট নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও জরুরী ঔষধপত্র পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৭) কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী সংস্থাসমূহের ব্যাপক অংশগ্রহণ;

(৮) এ খাতে ক্রমাগত সরকারী অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা;

(৯) এ কর্মসূচিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা; এবং

(১০) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সাথে মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা সম্পৃক্তকরণ (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

উপসংহার

পরিবার পরিকল্পনা একটি জন-সম্পর্কিত কর্মসূচি। জনসম্পর্কিত যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কোন কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নির্ভর করে সেই কর্মসূচির প্রতি তাদের সমর্থনসূচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনসূচক পরিবর্তন সাধনে সমাজের নেতৃবৃন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। সে হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির স্বার্থক বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টার সাথে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সমন্বিত হওয়া দরকার। সমাজে নেতৃস্থানীয় লোক বলতে বুঝায় শ্রমিক নেতা, মসজিদের ঈমাম, সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের নিকট সম্মানিত ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিবর্গ। যতদিন পর্যন্ত দেশের সকল লোক বিশেষ করে মহিলা ও যুব সমাজ এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন

হয়ে এর সমাধঅনের জন্য মিলিতভাবে সচেষ্ট না হবেন, ততদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হবে না। কাজেই প্রচেষ্টাকে সার্থক করার দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীর নয়, এই দায়িত্ব আপনার, আমার ও দেশের প্রত্যেক নাগরিকের।

তথ্য নির্দেশিকা

আলম, বিলকিস আরা ও আজম, কে, কিউ (সম্পাদিত) (১৯৮৭) *ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল।* ঢাকাঃ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট।

আক্তারুজ্জামান, মোঃ (২০০০) *বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম* (অপ্রকাশিত) ঢাকা।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৯ থেকে ১৯৯৮) *পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি* ঢাকা ঃ বিবিএস।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৯) *বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ পকেট বই ১৯৯৯।* ঢাকা ঃ বিবিএস।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮) *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,* ১৯৯৭-২০০০। ঢাকা ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

বাংলাদেশ সরকার (২০০০) *বাংলাদেশের জনসংখ্যা কার্যক্রম* (২০০০)। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

সালাহ উদ্দীন, এ, টি, এম (১৯৮৬) *আধুনিক জনবিজ্ঞান।* ঢাকা ঃ বুক হাউস।

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ইসলামে নেতৃত্ব প্রক্রিয়া

মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন*

Leadership in Islam. Md. Golam Mohiuddin

Abstract : Leadership in Islam is a trust. Often, it takes the form of an explicit contract or pledge between a leader and his followers that he will try his best to guide them, to protect them and to treat them fairly and with justice. Hence, the focus of leadership in Islam is on integrity and justice. Given the recent emphasis on ethical behaviour in the leadership literature (Kouzes and Posner, 1995), an examination of the moral bases of leadership from an islamic perspective may provide some interesting insights for the field of leadership in general. In this paper, we will examine what leadership is from an islamic perspective, discuss the moral dimension of leadership and uncover the characteristics of leaders and followers as suggested by Islam.

ইসলামে নেতৃত্ব একটি প্রত্যয়ের নাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি নেতা এবং তার অনুসারীদের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তি বা অঙ্গিকারের রূপ নেয় যে, নেতা তাদের পরিচালনা ও সুরক্ষা করবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ও ন্যায় সঙ্গত আচরণ করবে। একারণে ইসলামী নেতৃত্ব বিশুদ্ধতা ও ন্যায়পরায়ণতা সংহত। সম্প্রতি নেতৃত্ব সম্পর্কিত সাহিত্যে নৈতিক আচরণের যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তাতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে নেতৃত্বের নৈতিক ভিত্তির অনুসন্ধানে কয়েকটি আকর্ষণীয় দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে নেতৃত্বের সংজ্ঞা ও তার নৈতিক মাত্রাসমূহ অনুসন্ধান এবং ইসলামের প্রস্তাবনা অনুসারে নেতা ও অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

* প্রভাষক, ডিবিএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

নেতৃত্বের সংজ্ঞাঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

সর্বপ্রথমেই বলতে হয়, নেতা বা অনুসারী হিসাবে মুসলমানদের আচরণের ভিত্তি হলো আল্লাহর বাণী যা ঐশীগ্রন্থ কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের নবী মোহাম্মদ (সা.) সর্বযুগের মুসলিম নেতা ও অনুসারীদের জন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। এই বিশ্বাস মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কিত আল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত।

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (আল কোরআন)।

এটিই মোহাম্মদ (সা.) এর দৃষ্টান্ত, মুসলিম নেতা ও অনুসারীরা যার অনুসরণের চেষ্টা করে। নবী মোহাম্মদ (সা.) এর মতে ইসলামী নেতৃত্ব ক্ষুদ্রতম কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিটি ব্যক্তিই পরিস্থিতি অনুসারে একটি দলের 'মেষ পালকের' মত নেতৃত্বের একটি অবস্থান জুড়ে থাকে (Sahih Bukhari)। হাদিসে বর্ণিত আছে 'তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং প্রত্যেকেই তার অভিভাকত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' (Sahih Bukhari)।

জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমানেরা নেতা নির্বাচনে এবং তার অনুসরণে বাধ্য। মোহাম্মদ (সা.) এর মতে, মুসলমানেরা অবশ্যই কোন ভ্রমণে, এবাদতে এবং অন্য যে কোন সম্মিলিত তৎপরতার ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন করবে। অতএব, নেতৃত্বকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, যার মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে একজন নেতা অনুসারীদের স্বতঃপ্রণোদিত অংশ গ্রহণের চেষ্টা করেন। এই সংজ্ঞা হতে সুস্পষ্ট যে, নেতৃত্ব মূলত অপরিহার্যভাবে একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা নেতা স্বতঃস্ফূর্ত অনুসারীদের পরিচালনা করেন। নেতার সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, সে অন্যদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না।

"ধর্মে কোন জোর দবরদস্তি নেই" কোরআন (২ : ২৫৬)।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নেতার প্রাথমিক দুটি ভূমিকা হলো-'সেবক নেতা' ও 'অভিভাবক নেতা'। প্রথমত "নেতা হলেন অনুসারীদের সেবক।" তিনি

অনুসারীদের কল্যাণ সাধন এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবেন। সেবকরূপে নেতার এই ভূমিকা ইসলামের অংশ হিসাবে তার প্রাথমিক কাল হতেই প্রচলিত। সম্প্রতি Robest Grenleaf এ ধারণার উন্নতি সাধন করছেন (Qrenleaf, 1970):

The servant leader is servant first ... it begins with the natural feeling that one wants to serve, to serve first. The best test, and the most difficult to administer, is : do those served grow as persons?

নবী মোহাম্মদ (সা.) মুসলিম নেতার দ্বিতীয় বড় ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন; তা হচ্ছে নিজের সম্প্রদায়কে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতা, তাকওয়াকে উৎসাহিত করা এবং ন্যায়বিচার চালু করা। "মুসলিমদের নেতা তার অনুসারীদের ঢাল স্বরূপ" (আল হাদিস)।

সেবক বা অভিভাবক হিসাবে একজন মুসলিম নেতা ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ভিত্তিকে ব্যবহার করতে পারে, ইসলাম ক্ষমতার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় কিন্তু একই সাথে এর ব্যবহারে কয়েকটি শিষ্টাচারেরও প্রস্তাব করে।

নেতৃত্ব ও ক্ষমতার ভিত্তি

ক্ষমতা হচ্ছে সেই সামর্থ যা কোন উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য উপায়সমূহকে পরিচালিত করে। নেতৃত্ব সম্পর্কিত সাহিত্যে ক্ষমতার সচরাচর ব্যবহৃত পাঁচটি ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম এই ভিত্তিগুলোকে একত্রে গ্রন্থিত করে কিন্তু বিভিন্নভাবে নিরীক্ষণ করে। বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। বিধিবদ্ধ ক্ষমতা

ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা সংগঠন ব্যক্তির অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণত ইসলাম মুসলমানদেরকে সক্রিয়ভাবে ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে। কোন পদ লাভের জন্য প্রচারণা, নিজ অগ্রগতি এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে কর্তৃত্বের প্রতি ব্যক্তির মোহকে সুস্পষ্ট করে; মোহাম্মদ (সা.) বলেন-"কর্তৃত্ব

অর্জনের প্রত্যাশা করোনা, কেননা কর্তৃত্ব চেয়ে নেবার ফলে তুমি একায় পরিণত হবে (সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনে আল্লাহর সাহায্যের অনুপস্থিতিতে), এবং অনুরোধ ছাড়াই পদলাভের ক্ষেত্রে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (কর্তব্য পালনে আল্লাহর সাহায্য দ্বারা) (Sahih Muslim)।

সম্ভাব্য সংকট বা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এই নির্দেশের ব্যতিক্রম হতে পারে। বিশেষ দক্ষতার অধিকারী হওয়ার কারণে অন্যদের সাহায্যের জন্য একজন ব্যক্তি পদলাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। যেমন ইউসুফ (আ.) মিশরের রাজার নিকট শস্য ভান্ডারের দায়িত্বের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শুভ ইচ্ছা জড়িত কাজ ইসলামের নির্ধারণী বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

২। পুরস্কারমূলক ক্ষমতা

পদাধিকারী একজন নেতা সাংগঠনিক কাজে পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। যেমন বেতন প্রদান, প্রত্যাশিত কাজের দায়িত্ব বা পদোন্নতি, ইসলামের ক্ষেত্রেও উহা সমানভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের উচ্চহারে বেতন প্রদান করতেন। উৎকোচ দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়া থেকে তাদের বিরত থাকা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে চাইতেন। ন্যায়সঙ্গত পন্থায় ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে উমর (রা.) একজন বিশিষ্ট ইসলামী নেতাদের একজনে পরিণত হয়েছিলেন।

৩। দমনমূলক ক্ষমতা

সাংগঠনিক পুরস্কার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কর্তৃত্বধারী নেতা অধঃস্তনদের অধিকারসমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। ইসলাম দমনমূলক ক্ষমতার বৈধতার স্বীকৃতি দেয় কিন্তু অন্যায়ের দিকে অনুসারীদের বাধ্য করার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগকে বাধা দেয়; নবী করিম (সা.) বলেছেন- "নেতার প্রতি আনুগত্য শুধুমাত্র ন্যায়ের ক্ষেত্রে" (সহীহ বোখারী)। সেবক হিসাবে নেতার ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ওমর (রা.) জনগণকে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের শাস্তি প্রদান বা সম্পদ গ্রহণের জন্য শাসক ও প্রতিনিধি নির্বাচিত হইনি, বরং আমি তোমাদের শিক্ষা ও সেবার জন্য নিয়োজিত" (Al-Buray, 1985)।

৪। দক্ষতা ক্ষমতা

নেতৃবৃন্দের কাজ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্যগত দক্ষতামূলক কিছু ক্ষমতা থাকে। যদ্বারা সে অনুসারীদেরকে কাজের বিষয় অবহিত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ নামাজের ইমামতির ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞানের আলেম হওয়ার কারণে একজনকে বাছাই করা হয় যিনি উক্ত জামাতের সকলের নেতৃত্ব দিতে পারেন। তবে ইসলামে কোন যাজক নেই।

৫। সম্মোহন বা ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা

একজন ব্যক্তিকে যখন অন্যেরা অনুসরণ করে তখন দেখা যায় তার ব্যক্তিত্বে অন্যদের আকর্ষণ করার মত কিছু ক্ষমতা থাকে। যারা জন্মগতভাবে নেতা তারা স্বভাবতঃই সম্মোহন ক্ষমতার অধিকারী। নৈতিক অলৌকিক নেতৃবৃন্দ যেমন মোহাম্মদ (সা.) এবং অন্য সকল নবীগণ মানুষের কল্যাণে শক্তি নিয়োগ করতেন, মানুষের সমালোচনা থেকে শিখতেন, তাঁদের সাহাবীদের অনুসারী থেকে নেতা বানানোর জন্য কাজ করতেন এবং নৈতিকতার মানের উপর নির্ভর করতেন। সম্প্রতি আমেরিকার 'ম্যালকম এক্স' ছিলেন চমৎকার ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মুসলিম নেতা। তাঁর বক্তব্য শুনে ও লেখা পড়ে বহু আমেরিকান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। "ম্যালকম বাস্তব জীবনে দক্ষ বক্তব্যের চেয়েও বেশী কিছু দেখিয়েছেন। উত্তম প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন মানুষের মাঝে। তিনি দেখিয়েছেন এই দৌড় সচেতন সমাজে একজন মানুষের জন্য ধর্ম কি ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে ধর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে কিভাবে একজন মানুষ তার নিজের এবং অপরের জীবন ধারাকে পরিবর্তন করতে পারে" (Barboza, 1994)। ইসলামী নেতৃত্বের নৈতিক ভিত্তিই একজন মুসলিম নেতাকে অন্তর্নিহিত শক্তি হিসাবে পরিচালনা করে থাকে।

ইসলামী নেতৃত্বের নৈতিক ভিত্তিসমূহ

ইসলামে নেতৃত্ব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মধ্যে নিহিত। আল্লাহর এবাদতেই তা কেন্দ্রীভূত। "এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা; তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত; তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ

করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে; তাহারা আমারই ইবাদত করিত" (কোরআন-২১ ঃ ৭৩)।

আল্লাহর এবাদত করতে একজন মুসলমান নেতাকে আল্লাহর আদেশ অনুসারে এবং রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক কাজ করতে হবে, এবং তাকে হতে হবে প্রকৃত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহর প্রতি তাঁর ধাপে ধাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশ্বাসেই নৈতিক চরিত্রের উন্মোচন ঘটবে। যা চারটি আধ্যাত্মিক উন্নয়ন তথা-ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহছানের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। এখানে প্রত্যেকটি স্তরকেই ব্যাখ্যা করা হলো-যা কিভাবে একজন মুসলিম নেতাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে তা বুঝা যাবে।

ঈমান

ইসলামে নৈতিক চরিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো ঈমান বা আল্লাহতে এবং তাঁর রাসূল (সা.) এর উপর বিশ্বাস। ঈমান এক আল্লাহতে এবং তার রাসূল (সা.) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শিখায়। একজন সঠিক ঈমানদার নেতা নিজেকে এবং তার সবকিছুকে একমাত্র আল্লাহর অধীন মনে করেন। তিনি তাঁর ধ্যান ধারণা, আবেগ সবকিছুকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন। ঈমান, পরকাল ও হাশরের দিনের বিচারের কথা বিশ্বাস করতে বলে, যেদিন প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্মের ফল পাবে। শক্ত ঈমানদার একজন মুসলিম নেতা কখনোই তাঁর কর্তব্যকে অবহেলা করেন না এবং সবসময়ই ভালো কাজের গুরুত্ব দেন। এই মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য কোরআন ঈমানকে ৬০ বৎসরেরও বেশী সৎকাজের সাথে যুক্ত করেছেন।

যদিও মুসলমানরা সব সময়ই একজন ঈমানদার নেতা চান কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিত্ব সব সময় খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না। একটা সংগঠনকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন খাঁটি মুসলিম যার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা কম এবং একজন দক্ষ নেতা যাঁর ইসলামী জ্ঞান কম তাদের মাঝ থেকেই বেছে নিতে হয়। ওমর ইবনুল আসের কথা এখানে আসতে পারে। তিনি মাত্র চার মাসের মুসলিম ছিলেন যখন রাসূল (সা.) কর্তৃক তাকে একটি চূড়ান্ত নেতৃত্বে নির্বাচন করা হয়েছিল। এই

ব্যাপারটা ইবনে তাইমিয়া কর্তৃক তাঁর 'আসি আসহে আশ শারিয়া' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। একজন দুর্বল নেতা কোন সংগঠনের যেমন পতন নিয়ে আসতে পারেন তেমনি একজন দক্ষ নেতা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

ইসলাম

ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম হচ্ছে মুসলিম নেতা ও অনুসারীদের নৈতিক ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর। ইসলাম মানে হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ঈমানের জন্যেই একজন নেতা/নেত্রী নিজেকে কখনো সর্বোচ্চ ভাবেন না। আলী (রাঃ) মিশরের শাসক মালিক আল আলতারকে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন "মালিক তোমার কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে তুমি যদি তাদের শাসকও হও খলিফা তোমার শাসক এবং আল্লাহ হচ্ছেন খলিফার উপরেও সর্বোচ্চ শাসক " (Behzadnia, 1981)।

তাক্বওয়া

একজন মানুষ যখন ইসলামের মাধ্যমে তাঁর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাজে সমর্পণ করেন তখন আল্লাহর প্রতি তাঁর একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার জন্ম নেয়। আল্লাহর প্রতি তাঁর এই আবেগ, তাঁর কর্তব্য সচেতনতা এবং তাঁর কাজের সচেতনতাই হচ্ছে তাক্বওয়া।

যখন একজন মানুষ তাক্বওয়ার আলোয় সিক্ত হয় তখন তার মনের ছবি, চিন্তা, আবেগ, কাজ সবকিছুই ইসলামের প্রতিফলন করে। তাক্বওয়াই একজন মুসলিম নেতা ও অনুসারীদের (বিশ্বাসীদের) তাদের সমাজের যে কোন জনের সাথে অবিচার করা থেকে দূরে রাখবে। "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" (কোরআন ১৬ ঃ৯০)।

ইহছান

যখন তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভয় এবং আল্লাহর উপস্থিতি, তখন ইহছান

হচ্ছে আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা। আল্লাহর প্রতি এই ভালবাসা একজন মুসলিমকে শিক্ষা দেয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করার। মোহাম্মদ (সা.) ইহছানকে এভাবে বর্ণনা করেন- "আল্লাহর এবাদত এমনভাবে করতে হবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ, যদি তুমি তা অর্জন করতে না পার তবে এমনভাবে ভাবতে হবে যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন" (আল হাদিস)।

এই অনুভূতি যে 'আল্লাহ তোমাকে দেখছেন'- একজন মুসলিম নেতা বা অনুসারীদের সর্বোচ্চ সার্থকতার সাথে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। একজন মুসলিমের ত্বাকওয়ার গুণাবলী এবং ইহছানের গুণাবলীর পার্থক্য বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যায়। সরকারী চাকুরীজীবিদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন যারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেন কিন্তু দায়িত্বের অতিরিক্ত কোন কাজ করেন না। আর কিছু লোক আছেন যারা স্বেচ্ছায় দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ করেন, তাঁরা শক্তিসম্পন্ন এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কর্মজীবিদের প্রথম দলটি মনে করে তার যে দায়িত্ব পালন করছেন তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। এরা ঐ সমস্ত লোক যাদের মধ্যে তাক্বওয়া আছে। অপরদিকে কর্মজীবীদের দ্বিতীয় দলটিতে আছে ইহছান। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও অনুসারী যারা ইহছানের অধিকারী তারা কঠিন বিপদের মুহূর্তে ও ক্লান্তিহীন ভাবে ইসলামের পতাকা বহন করেন। এই আলোচনা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীরা নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে ঈমান, ইসলাম, তাক্বওয়া ও ইহছানের কোন স্তরে আছেন।

ইসলামী নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে নেতারা ইসলামী আচার আচরণের পাঁচটি মানদণ্ডের উপর বিশেষভাবে জোড় দিয়েছেন। যেগুলো হলোঃ ন্যায় বিচার, পারস্পরিক বিশ্বাস, পূণ্যবানতা, আত্মউন্নয়নের প্রচেষ্টা ও ওয়াদা পালন করা।

১। **ন্যায় বিচার ঃ** ন্যায় বিচার হচ্ছে একটি গতিশীল বৈশিষ্ট্য যা প্রতিটি মুসলমান উন্নয়নের চেষ্টা করবে, হোক সে নেতা কিংবা কর্মী। "হে মুমীনগণ!

আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষাদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাস তোমাদিগকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে ইহা তাক্বওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সমস্ত খবর রাখেন" (কোরআন ঃ ৫ :৮)।

ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা নেতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোরআন এই ব্যাপারে জোর দিয়ে বলেছে "যাঁরা বেহেস্তের ব্যাপারে সর্বোচ্চ স্তরে পুরুস্কৃত হবেন।" "এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন তাহারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।" (কোরআন-২৫ঃ৬৭)।

ন্যায় বিচারের নীতি নেতা ও অনুসারীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ মুসলমানদের মৃদু ভৎর্সনা করেন এভাবে-"আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে।"(কোরআন ঃ ৪-৫৮)। এই কারণে হযরত মোহাম্মদ (সা.) জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন যে, বিচার ব্যক্তি সম্বন্ধীকরণের ক্ষেত্রে আপোষ মিমাংসা হবে না।

২। পারস্পরিক বিশ্বাসঃ পারস্পরিক বিশ্বাস পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের ধারণা জোর দিয়ে প্রকাশ করে।

"হে মুমীনগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ ও তাহার রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেনা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না।" (কোরআন-৮ঃ২৭)। ইসলামে শিষ্টাচারের মূল হচ্ছে বিশ্বাস যা সামাজিক সম্পর্কের প্রধান কেন্দ্র বিন্দু। কোরআনে নেতার সাথে বিশ্বাসের সুস্পষ্ট সংযোগের উল্লেখ আছে। আমরা হযরত ইউসুফ (আ.) এর ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। তিনি একজন মহান বিশ্বাসী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। এজন্য তাকে শস্যভান্ডার এবং গুদামঘরের বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়।

৩। পূণ্যবানতাঃ পূণ্যবান আচরণসমূহকে কোরআন নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

"পূণ্যবানতা হচ্ছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ প্রেমে পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে" (কোরআন ২:১৭৭)। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে ধার্মিক নেতাদের কিছু নীতি মূখ্যরূপে বিবেচিত হয়ঃ

- তারা সঠিক কাজ করেন এবং ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে অন্তরায় হতে দেন না।
- তারা ঈমানের বলে বলীয়ান।
- তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থীদের প্রতি যত্নবান হন।
- তারা এবাদতে ধীরস্থির এবং নামাজে উদার।
- চুক্তির ব্যাপারে সচেতন বা ওয়াদা রক্ষাকারী।
- সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় তারা ধৈর্য্যশীল।

সাধারণভাবে নেতাকে সংগঠনের সকলের প্রতি মর্যাদা ও সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করা উচিত এবং যথাসম্ভব ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। কোন ইসলামী সংগঠনের নেতাকে তার অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে-এটা প্রত্যাশা করা হয়।

৪। আত্মউন্নয়নের প্রচেষ্টা

এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সা.) আত্মউন্নতির জন্য নফসের সাথে জেহাদ করার প্রতি বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসী আছে- যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে, কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজের

জান মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। যারা জান মালের বিষয়ে মানুষকে বিশ্বাস করে; যারা মহান গৌরবময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমস্ত লোভ লালসা সংবরণ করে"। আত্মসংগ্রামের চেষ্টা ব্যক্তিকে ঈমান থেকে ইহছান এবং ধারাবাহিকভাবে আরো উচ্চ পর্যায়ের দিকে অগ্রসর করে।

আত্মসংগ্রামের এই নীতি আত্মশুদ্ধির একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আত্ম উন্নয়ন ঘটে থাকে। নেতা এবং অনুসারীরা এই নীতি চর্চার মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা ও কার্যকলাপকে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে এবং এইভাবে আত্ম উন্নতি লাভ করে। তারা নিজেরা অনুশীলনের মাধ্যমে এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং অন্যদেরকেও এই আত্মউন্নতির জন্য উৎসাহিত করে।

৫। ওয়াদা পালন

সকল মুসলমান, হোক সে নেতা বা অনুসারী, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য দৃঢ়বদ্ধ থাকে এবং তারা ইসলাম বিরোধী কোন প্রতিজ্ঞা করে না। আল্লাহ বলেন, "হে মুমীনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে" (আল কোরআন, ৫ ঃ ১)। ওয়াদা রক্ষা মুসলমানের বৈশিষ্ট; আর ওয়াদাভঙ্গ করা মুনাফেকী।

ওয়াদা রক্ষা করা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন নেতাই এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি থেকে বাইরে নন। আবু দাউদ্ শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হামসা বলেন, "নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর কাছ থেকে কিছু জিনিস এনেছিলাম এবং একটা নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম। যখন তিনদিন পর আমার মনে পড়ে ছিল তখন আমি ঐস্থানে গেলাম এবং তাঁকে স্বস্থানে দেখলাম। তিনি বললেন, আমি এখানে তোমার জন্য তিন দিন ধরে অপেক্ষ করছি।"

নেতার বৈশিষ্ট্যবলী

এতক্ষণ আমরা ইসলামী নেতৃত্বের ভিত্তিসমূহ আলোচনা করলাম। নিম্নে আমরা মুসলিম নেতা ও অনুসারীদের মান নির্ধারণী যে সকল বৈশিষ্টাবলী থাকা প্রয়োজন

সেগুলো আলোচনা করব। নেতার বৈশিষ্ট্যাবলী তার আচরণকে প্রভাবিত করে। ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে যে সকল বৈশিষ্ট্যাবলী গবেষণায় পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। **সততাঃ** নেতা সৎ হিসাবে বিবেচিত হয় তার কাজ কর্মের দৃঢ়তা দ্বারা। তারা কথায় যা বলে তা কর্মে পরিণত করে। কোরআনে মূসা (আ.) কে 'দৃঢ় ও বিশ্বাস যোগ্য' বলা হয়েছে। ইউসুফ (আ.) বর্ণিত হয়েছেন একজন সত্যবাদী হিসাবে। মোহাম্মদ (সা.) 'সাদিক'[১] (সত্যবাদী) ও 'আমিন' (বিশ্বাসী) হিসাবে তাঁর যৌবনে তদানিন্তন আরবে পরিচিত ছিলেন।

২। **যোগ্যতা/ক্ষমতাঃ** অনুসারীরা যা করছে নেতা তা জানেন- যদি বিষয়টি এ রকম হয় তবে নেতার নির্দেশ পালনে অনুসারীরা বেশী পরিমাণে অনুপ্রাণিত হবে। অনুসারীরা যদি নেতার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহে ভোগেন তাহলে তার নির্দেশ গ্রহণ করতে তারা উৎসাহ হারাবে। হলেন্ডারের মতে একজন নেতা নির্দিষ্ট একটি অবস্থায় যোগ্য হলেও অন্য অবস্থায় তিনি অনুপযুক্ত হতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে হযরত মোহাম্মদ (সা.) ওহীর দ্বারা পরিচালিত হয়েও বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাহাবীদের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তা অনুসরণ করতেন। রহমানের মতে- "সক্ষম সকল সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন ও পরামর্শ দিতেন এবং এমনি করে একটি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিকে সর্বোত্তম পন্থা বের করতেন" (Rahman, 1990)।

৩। **অনুপ্রেরণা ঃ** অনুসারীরা নেতার পিছনে থেকে ভবিষ্যতে কোন মন্দা অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে এমনটি যেন প্রত্যাশা না করে। নেতা কখনো আশা হত হবেন না। একজন নেতা কীভাবে তার অনুসারীবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করেন তার একটি বাস্তব নমুনা হযরত আবু বকর (রা.) হতে আমরা শিখতে পারি। নবী করিম (সা.) এর মৃত্যুর পর মুসলমানেরা খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ওমর (রা.) কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন। আবু বকর (রা.) তাঁকে শান্ত করে ছিলেন নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন-

"ও লোকেরা, যদি তোমরা গভীর শ্রদ্ধার সহিত মোহাম্মদ (সা.) এর এবাদত কর তাহলে জেনে নাও যে তিনি মৃত। আর যদি তোমরা আল্লাহর এবাদতী হও তা হলে জেনে নাও আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরবেন না।"

৪। **ধৈর্য্যঃ** কোরআনে আল্লাহ পাক ইসলামী নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম গুণ ধৈর্য্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। "এবং আমি উহাদিগের মধ্যে হইতে নেতা মনোনিত করিয়াছিলাম যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করিত। যখন উহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল তখন উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী" (কোরআন, ৩২ : ২৪)।

বস্তুত: একজন নেতাকে অনুসারীদের তুলনায় অধিকমাত্রায় পরীক্ষিত হতে হবে এবং তাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মক্কার জিন্দেগীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাহার অনুসারীদের যে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে কষ্ট দিত তখন দ্বীনের নবী মোহাম্মদ (সা.) কিভাবে ধৈর্য্য ও নম্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিম্নোক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "সাহাবীরা যখন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ (সা.) এর কাছে এসে তাদের ক্ষুধার কথা বলল এবং তাদের কাপড় সরিয়ে দেখালেন যে, আমরা প্রত্যেকে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে একটা পাথর বেধে রাখছি, তখন মোহাম্মদ (সা.) কাপড় সরিয়ে দেখালেন যে, তাঁর পেটে দু'টো পাথর বাঁধা রয়েছে" (তিরমিজি শরীফ)।

৫। **নম্রতাঃ** একজন মুসলিম নেতা নম্র স্বভাবের হবেন এবং তিনি কখনোই নিজের মর্যাদার জন্য অহংকার বোধ করবেন না। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) একটি সাধারণ বাড়ীতে বাস করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কোন দেহরক্ষী ছিলনা এবং কোন রক্ষী ছাড়াই তিনি মদীনার পথে প্রান্তরে চলাফেরা করতেন। আলী (রা.) তাঁর খিলাফতকালে মালিক আল আসতাবেন নোখাইকে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং তাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন দাম্ভিকতা পরিহার করে চলার জন্য। এবং কেন তিনি গর্ব অহংকার পরিত্যাগ করবেন তার ব্যাখ্যাও তিনি তাকে দিয়েছিলেন এভাবে, "কখনোই নিজে একথা

বলবে না যে, আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের শাসক তোমরা নীচ ও বাধ্য হয়ে অবশ্যই আমাকে সম্মান করবে। তুমি যদি এই ধারণা পোষণ কর তাহলে মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়বে। ব্যর্থ এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীতে পরিণত হবে। ধর্মের উপর বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখবে এবং অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভের চিন্তা না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমাকে তৈরি করবে।"

৬। পরামর্শ গ্রহণের মানসিকতাঃ ইসলাম সকল কাজকর্মে পরামর্শকে জোর দিয়ে থাকে। কোরআনের নির্দেশানুসারে "আমরুহুম শূরা বাইনাহুম"-হযরত মোহাম্মদ (সা.) সকল বিষয়ে সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষমতা প্রয়োগের সীমা হল কোরআন ও সুন্নাহ। তবে এই ব্যাপারে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শূরা বা পারস্পরিক পরামর্শ একটি গভীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এইজন্য একজন মুসলিম নেতাকে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে।

অনুসারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধরনঃ

অনুসারীদের চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টিতে নেতৃত্বের বাস্তব জীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। নেতারা যদি যথাযথভাবে তাদের সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদন করেন তাহলে এটা তাদের অনুসারীদের আচরণের উপর প্রভাব রাখে। নেতৃত্বের জন্য এরূপ গুণসম্পন্ন অনুসারীই প্রয়োজন যারা সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নেতার আনুগত্য করবেন (Backan and Badawi)।

ক) আনুগত্যঃ হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "শোনা এবং তা মানাই হচ্ছে একজন মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য, উভয় বিষয়ই তার মতানুযায়ী হউক আর না হউক।" ইসলাম নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে এতই গুরুত্ব দেয় যে, কেউ নেতার অবাধ্য হলে তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তবে কোন বিশেষ অবস্থায় তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

খ) সক্রিয় অনুসারীঃ ইসলাম জোরালভাবে নেতার নির্দেশ পালনের জন্য

উৎসাহ প্রদান করেছে তবে অন্ধভাবে বশ্যতা স্বীকার করার কথা বলা হয়নি। আর এজন্য প্রয়োজন সক্রিয় এবং বিজ্ঞ অনুসারী। একবার হযরত ওমর (রা.) এক বিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যে দেন মোহরের কথা উত্থাপন করলেন। কিন্তু তিনি যা বললেন তা ইসলামের বিধি বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলনা। একজন মহিলা অবিলম্বে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "ওহে ওমর, আল্লাহকে ভয় কর।" মহিলার কথা শোনা মাত্রই ওমর (রা.) কোরআনের নির্দেশ স্মরণ করলেন, ওমর (রা.) তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং বললেন, "মহিলার বক্তব্য সঠিক এবং মুসলমানদের নেতা হয়েও তিনি ভুল করেছেন।" হযরত ওমর (রা.) এর আচরণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে অনুসারীরা নিস্ক্রীয় নয়, নেতার আকষ্মিক ভুলে তারাও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার

একজন আদর্শ মুসলিম নেতা এমন হবেন যে, তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করবেন। বিশেষ করে তিনি হবেন আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী এবং আল্লাহর বান্দা হিসাবে নিজের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী। একজন মুসলিম নেতা হবেন সত্যপরায়ণ, ধর্মপরায়ণ, আত্তোন্নতির জন্য কঠোর সাধনাকারী, এবং সর্বাবস্থায় ওয়াদা পালনকারী। তিনি অন্যের সাথে পরামর্শ করবেন বিশেষ করে যেখানে তিনি যোগ্য নন। তিনি সকল বিপদ আপদে ধৈর্য্য ধারণ করবেন এবং হবেন সর্বদা বিনয়ী।

তথ্য নির্দেশিকা

1. Al-Buray. M. (1985), *Administrative Development* : An Islamic Perspective Page-248.
2. *Al-Quranul Karim*: Bengali translation of Holy Quran. Verse 68 :4
3. Barbozas American jihad : *Islam after Malcolm-x, Page 16*
4. Beekan R. and Badawi J. *The Leadership Process in Islam.*
5. Behzadnia A. and Deny,s (1981). *To the Commander in chief* : From Imam Ali to Malik E Ashter-Page -8.
6. Brahman A. (1990) *Mohammed as a Military Leader.* 170.

7. French, J. R. P and Raven. B. (1959) *The leases of social power : Studies in social power*, University Michigan. 150-167

8. Grenleaf Robert (1970) *The servant as leader*. Page 7

9. Islamic Scholar Software. (1996), *Misquote-Al-Masabih*. South Africa.

10. *Sahih Bukhari*. Hadith No-3,733.

11. Sahih Bukhari. Hadith No. 3,733

12. *Sahih Muslim*, Hadith No. 1013

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

ঢাকা ইপিজেড সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগঃ একটি পর্যালোচনা

খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব *

Foreign Direct Investment in Dhaka EPZ : An Overview.

Khondoker Abdul Mottaleb

Abstract: The industrial sector of Bangladesh is not very strong. Because of low rate of domestic savings and investment, investment demand in the industrial sector cannot be meet only by internal resources. The Government of Bangladesh is trying to increase the investment in industrial sector by welcoming the Foreign Direct Investment (FDI). Export Processing Zone (EPZ) is one of the most important and powerful tools for attracting FDI. There are two EPZs are in operation in Bangladesh. These are Dhaka EPZ and Chittagong EPZ. As a result of the success of these EPZs Govt. is now going to set up another three EPZs in different parts of the country. In this paper an attempt has been made to find out the nature of foreign investment in DEPZ. This article also focuses the nature of foreign enterprises and their production in this Export Processing Zone.

সূচনা

বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ প্রায় প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের এখন এক অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অনেক সামাজিক ও অন্যান্য মূল্য থাকা সত্ত্বেও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফ ডি আই) বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের যথাযথ বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক আগেই। এফ ডি আই এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের

* গবেষণা কর্মকর্তা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

মাধ্যমে তাইওয়ান, দঃ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং হংকং নব্য শিল্পায়িত দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। বস্তুত এই দেশগুলির নাটকীয় উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহ এফ ডি আই এর যথাযথ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এফ ডি আই এর প্রবাহ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। এফ ডি আই এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুব বেশী দিনের নয়। ১৯৮০ সালে Foreign Private Investment Act পাশ হয় এবং বাংলাদেশ এর পরই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশী বিনিয়োগ আসতে শুরু করে ১৯৯১ (রিভাইসড ইন ১৯৯২) সালের শিল্পনীতি ঘোষণার পর। এ সময় দেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি কাঠামোগত সমন্বয় সাধনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। বিভিন্ন কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে আকর্ষণীয় আর্থিক ও ভৌত সুবিধাদি প্রদান, কর রেয়াত, বিনিয়োগ বোর্ডকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত করা, ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানা অনুমোদন, বিশেষ এলাকায় শিল্প স্থাপনে বিশেষ সুবিধা প্রদান, শিল্প এলাকা স্থাপন ইত্যাদি। বিনিয়োগ আহরণের বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে Export Processing Zone (EPZ) বা ইপিজেড স্থাপন করা যথেষ্ট কার্যকর বলে বিবেচিত। এই ইপিজেড আবার Free Trade Zone, Investment Promotion Zone, Free Export Zone ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে পারে (Reza, Alam and Rashid, ১৯৮৪)। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এই বিশেষায়িত এলাকাগুলোতে উন্নত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সুবিধাদি যেমন ওয়্যার হাউস, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ, টেলিফোন এবং আধুনিক ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগের সুবিধাদির পাশাপাশি বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত Incentivs দিয়ে থাকে:

১. দশ বৎসর পর্যন্ত কর মওকুফ এবং পরে আনুপাতিক হারে ৩০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানী আয়ের উপর শুল্ক হ্রাস;

২. উৎপাদন কার্যে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদির ওপর আমদানী শুল্ক মওকুফ;

৩. বিদেশী টেকনিশিয়ান এবং একজিকিউটিভদের বেতনের উপর তিন বৎসর পর্যন্ত আয়কর মওকুফ;

৪. বিদেশী লোনের সুদের ওপর কর মওকুফ;

৫. রয়্যালটি কারিগরী জ্ঞান এবং কারিগরী সহযোগিতা ফি এর উপর হতে কর মওকুফ;

৬. বিদেশী কোম্পানীগুলোর শেয়ার হাতবদলের ফলে যে লাভ হয় তার উপর কর মওকুফ;

৭. রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল আনয়নের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

এছাড়াও আরও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা রয়েছে (GOB, Board of Investment: ১৯৯৯)। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ বৈদেশিক বিনিয়োগের নীতিমালার দিক থেকে পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে উদার।

বিনিয়োগের মালিকানার ধরনের দিক থেকে ইপিজেডের শিল্পসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ এ শ্রেণীর শিল্প; বি শ্রেণীর শিল্প এবং সি শ্রেণীর শিল্প। এ-শ্রেণীর শিল্প হচ্ছে একশত ভাগ বিদেশী বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প। এখানে শিল্প মালিক বিনিয়োগকারী সম্পূর্ণভাবে বিদেশী। অন্যদিকে বি-শ্রেণীর শিল্প হচ্ছে দেশী এবং বিদেশী যৌথ বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প। সম্পূর্ণ দেশীয় বিনিয়োগকারী কর্তৃক স্থাপিত শিল্প হলো সি শ্রেণীর শিল্প। এই নিবন্ধে ঢাকা ইপিজেডে এ-শ্রেণীর শিল্প এবং বি-শ্রেণীর শিল্প বিনিয়োগের ধরন, স্থানীয় নিয়োগ, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইপিজেড এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিগত দুই দশকে বিশেষ করে ১৯৭০ এর দশকে ইপিজেড এর দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায় (Reza, Alam and Rashid, ১৯৮৪)। ১৯৬৬ সালে মাত্র

দুটি ইপিজেড লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একটি হল ভারতের Kandla এবং অন্যটি হল Puertorico এর Mayaguez (Reza, Alam and Rashid, ১৯৮৪)। ১৯৭০ সালের মধ্যেই এই সংখ্যা আট-এ উন্নীত হয়। এই নতুন ইপিজেডগুলি তাইওয়ান, ফিলিপাইনস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, মেক্সিকো, পানামা ও ব্রাজিল এ স্থাপিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯৭১ সাল হতে ১৯৭৫ সালের মধ্যে ২৩টি ইপিজেড গড়ে ওঠে। এই দেশগুলির অধিকাংশই ছিল এশিয়ার। তার মধ্যে মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, দঃ কোরিয়া ও ভারত প্রধান। ১৯৭৬-৭৮ সালের ভিতরে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডে আরও ২১টি এ ধরনের এলাকা গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮১ সালের মধ্যেই শুধুমাত্র এশিয়াতেই ২৬টি অনুরূপ এলাকা গড়ে ওঠে (Reza, Alam and Rashid, ১৯৮৪)।

বাংলাদেশে ইপিজেড

সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে স্থাপিত চট্টগ্রাম ইপিজেড ১৯৮৩ এবং ঢাকা ইপিজেড ১৯৯৩ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করেছে। এ দুটি ইপিজেডে ১১২টি শিল্প কারখানা উৎপাদনে আছে এবং আরও ১০৭টি শিল্প কারখানা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯: ৫৫)। ইপিজেডে অন্যান্য সুবিধাদির পাশাপাশি যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় তার মধ্যে ১০ বছরের জন্য কর রেয়াত, শুল্কমুক্ত তিনটি মটর গাড়ী আমদানী, শুল্কমুক্ত রপ্তানী ইত্যাদি প্রধান। নিম্নে সারণী-১ এ ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড এ স্থানীয় শ্রম নিয়োগ, বিনিয়োগ এবং রপ্তানী আয় দেখানো হয়েছে।

সারণী ১। ঢাকা ইপিজেড ও চট্টগ্রাম ইপিজেড এর বিনিয়োগ, কর্মসুযোগ ও রপ্তানী

অর্থবছর	ঢাকা ইপিজেড			চট্টগ্রাম ইপিজেড		
	বিনিয়োগ (মি ইউ এস $)	নিয়োজিত জনবল	রপ্তানী (মি ইউ এস $)	বিনিয়োগ	নিয়োজিত জনবল	রপ্তানী (মি ইউ এস $)
১৯৯০-৯১	–	--	--	২২.০৫	২৩৬৩	৪৭.৯৯
১৯৯১-৯২	--	--	--	২৩.৬৬	৫২৫০	৭৬.৯৯
১৯৯২-৯৩	--	--	--	২২.০৫	৩১১৪	১২৭.০৫
১৯৯৩-৯৪	৮.২২	৫৫২২	৫.২৫	২৯.১৮	৩০৮৬	১৪০.৩৫
১৯৯৪-৯৫	৮.২৬	১৮৪৪	৪১.২৮	২৭.৬৭	৪২৯৭	১৮৬.৯৮
১৯৯৫-৯৬	১৪.৪৫	৪৮৩১	৭৩.২২	১৬.১৩	৫৮৭৫	২৬৩.৮০
১৯৯৬-৯৭	৩১.০১	--	১১৯.৪৫	২২.৮৯	--	৩৪৩.৩১
১৯৯৭-৯৮ (মার্চ ,৯৮ পর্যন্ত)	১৩.৮০	--	১৩০.৭১	২৬.৬৯	--	৩৩০.৩৭

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭ ও ১৯৯৮; পৃ: ৫৬ ও ৪৬।

সারণী ২। বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ে ইপিজেডের অংশ

অর্থবছর	মোট রপ্তানী আয় রপ্তানী আয় (মি ইউ এস *)	ইপিজেড হতে রপ্তানী হতে রপ্তানী (মি ইউ এস $)*	মোট রপ্তানীতে অংশ (%)
১৯৯০-৯১	১৭১৮	৪৭.৯৯	২.৭৯
১৯৯১-৯২	১৯৯৪	৭৬.৯৯	৩.৮৬
১৯৯২-৯৩	২৩৮৩	১২৭.০৫	৫.৩৩
১৯৯৩-৯৪	২৫৩৪	১৪০.৩৫	৫.৫৩
১৯৯৪-৯৫	৩৪৭৩	১৮৬.৯৮	৫.৩৮
১৯৯৫-৯৬	৩৮৮৪	২৬৩.৮০	৬.৭৯
১৯৯৬-৯৭	৪৪২৭	৩৪৩.৩১	৭.৭৫

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ পৃ: ৫৬ ও ৪৬। * বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৯ পৃ: ১৫০।

সারণী-১ এবং সারণী-২ এ বাংলাদেশ ইপিজেড এর সাফল্য ফুটে উঠেছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমাগত হারে বেড়েছে। ফলস্বরূপ রপ্তানী আয়ে ইপিজেডের শেয়ারও ধীরে হলেও বাড়ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বেসরকারী ইপিজেড স্থাপনের বিল পাস হয়েছে এবং দক্ষিণ কোরিয়া কেইপিজেড নামে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় প্রথম বেসরকারী ইপিজেড স্থাপন করতে চলছে। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা ইপিজেডে বিদেশী বিনিয়োগ (এ-টাইপ এবং বি টাইপ) বিনিয়োগকারী দেশ এবং স্থানীয় নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে এই নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঢাকা ইপিজেডে বিদেশী বিনিয়োগ

ঢাকা ইপিজেড চালু হয় ১৯৯৩ সাল হতে। এখানে ১৯৯৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানায় (এ-টাইপ) এবং যৌথ উদ্যোগে (বি-

টাইপ) প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা ছিল ৭২টি যার মধ্যে চালুকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩৮টি। এই চালুকৃত ৩৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবার ৩০টি ছিল এ-টাইপ এবং ৮টি ছিল বি-টাইপ। অবশিষ্ট ৩৪টি শিল্প ছিল বাস্তবায়নাধীন। এই বাস্তবায়নাধীন ৩৪টির মধ্যে আবার ১৭টি ছিল এ-টাইপ এবং ১৭টি ছিল বি-টাইপ।

সারণী-৩ এ ঢাকা ইপিজিডে এ-টাইপ বিনিয়োগকারী দেশসমূহ, শিল্পের সংখ্যা, প্রস্তাবিত বিনিয়োগ, প্রকৃত বিনিয়োগ, প্রস্তাবিত স্থানীয় লোক নিয়োগ এবং প্রকৃত কর্মসংস্থান ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, এ-টাইপ শিল্পে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ হল দঃ কোরিয়া। ঢাকা ইপিজিডে দঃ কোরিয়ার মালিকানাধীন এ শ্রেণীর শিল্পের সংখ্যা হল ১৬টি। এই শিল্পগুলিতে এই দেশটির বিনিয়োগের পরিমাণ হল ৫০৪৬১০০০ মা: ড: যা মোট প্রকৃত বিনিয়োগের ৬০ ভাগের মত। ঢাকা ইপিজিডে এ-টাইপ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ হল হংকং (গণচীন) যার প্রকৃত বিনিয়োগ ২২৫৯১০০০ মা: ড: এবং তা মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ২৭ ভাগ। কিন্তু ঢাকা ইপিজিডে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এবং প্রকৃত বিনিয়োগ এবং প্রস্তাবিত স্থানীয় লোক নিয়োগ এবং প্রকৃত স্থানীয় লোক নিয়োগের মধ্যে বেশ ফারাক রয়েছে। সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ দঃ কোরিয়ার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হল ১৩১০৪৩০০০ মা: ড: কিন্তু বিনিয়োগ করেছে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাত্র ৩৮ ভাগ অর্থাৎ ৫০৪৬১০০০ মা: ড:। তেমনিভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ হংকং তার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাত্র ৪৬ ভাগ বাস্তবায়ন করেছে।

এভাবে প্রত্যেক বিনিয়োগকারী দেশের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এবং প্রকৃত বিনিয়োগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রস্তাবিত বিনিয়োগ এবং প্রকৃত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যবধান অনেক। সারণী-৩ এ দেখা যায় ঢাকা ইপিজিডে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ৩০টি এ-টাইপ শিল্পে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ হল ২৪৯৩৪৭০০০ মা: ড: কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৮৪৬৫১০০০ মা: ড: যা মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ৩৪ ভাগ মাত্র।

সারণী ৩। ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প বিনিয়োগ (এ-টাইপ) চালুকৃত

দেশের নাম	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (০০০ ইউ এস ডলার)		প্রকৃত মোট বিনিয়োগের অংশ	লোক নিয়োগ	
		প্রস্তাবিত	প্রকৃত		প্রস্তাবিত	প্রকৃত
জার্মানী	২	২,৩০	১৬৯৯ (৭৬%)	২%	৯৭৭	১৬৭৫
জাপান	২	২,২৭৮	১০৮৯(৪৮%)	১.৫%	১৬০	৯৫
মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর	২	৪৮,৫৪৮	৫৩৪৬ (১১%)	৬%	৫৮৮১	৯৯৮
তাইওয়ান	১	১০,০০০	৪৩৬ (৪%)	০.৫%	৫০০	১১৫
যুক্তরাজ্য	২	৩১৩৯	২০৩১ (৬৫%)	২%	৫৮০	৫২৫
যুক্তরাজ্য ও কানাডা	১	৩৩৪০	৯৯৮(৩০%)	১%	৮৭	১০৩
হংকং	৫	৪৮৭৭০	২২৫৯১(৪৬%)	২৭%	৭১১৫	৬২৪৩
দ: কোরিয়া	১৫	১৩১০৪৩	৫০৪৬১(৩৮%)	৬০%	১৭১০৮	১৩১৭০
মোট	৩০	২৪৯৩৪৭	৮৪৬৫১(৩৪%)	১০০%	৩২৪০৮	২২৯২৪ (৭১%)

উৎস : বিইপিজেডএ, ঢাকা, ১৯৯৯।

(বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো শতকরা হার প্রকাশ করছে)

ঢাকা ইপিজেডে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে খুব একটা সাফল্য আসেনি। প্রতিটি দেশের বিপরীতে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ (প্রস্তাবিত এবং প্রকৃত) বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারণী-৩ এ দেখা যায় যে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইপিজেডে চালুকৃত এ-টাইপ শিল্পে প্রস্তাবিত স্থানীয় নিয়োগ ছিল ৩২৪০৮ জন। কিন্তু কর্মে নিযুক্ত হয়েছে মাত্র ২২৯২৪ জন যা প্রস্তাবের ৭১ ভাগ মাত্র।

সারণী-৪ এ বাস্তবায়নাধীন এ-টাইপ শিল্পে প্রস্তাবিত বিদেশী বিনিয়োগ এবং প্রস্তাবিত লোক নিয়োগ দেখানো হয়েছে। ১৯৯৪ সাল হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইপিজেডে বাস্তবায়নাধীন এ টাইপ শিল্পে সংখ্যা ছিল ১৭টি। এসব শিল্পে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হল ২৬৮৪৯৫০০০ মা: ড: এবং প্রস্তাবিত কর্মসুযোগ হল ১৪৩২৩জন। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এ বিপুল বিনিয়োগের মাত্র ২.২২% অর্থাৎ ৫৯৫১০০০ মা: ড: নিয়োজিত হযেছে। সারণী-৪ এ এটা দেখা যায় যে, বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি দেশ বিনিয়োগ করেছে। এ তিনটি দেশ হল হংকং (১৪১৯০০০ মা: ড:), ইতালী (৫৪২০০ মা: ড:) এবং দ: কোরিয়া (৩৯৯০০০০ মা: ড;)। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বাস্তবায়নাধীন এ-টাইপ শিল্পেও সর্বোচ্চ বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে দ: কোরিয়া থেকে। এ দেশের প্রস্তাবিত বিনিয়োগে শিল্পের সংখ্যা ৮টি এবং প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হল ৮৮৯৮১০০০ মা: ড:।

সারণী-৪ এ উল্লেখিত ১৭টি বাস্তবায়নাধীন শিল্প বাস্তবায়িত হলে মোট ১৪৩২৩ জনের কমংসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ঢাকা ইপিজেডে বি-টাইপ শিল্প বিনিয়োগের অবস্থাও এ-টাইপ শিল্পে চেয়ে ভালো কিছু নয়। এখানেও প্রস্তাবিত এবং প্রকৃত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। সারণী-৫ এ বি-টাইপ শিল্প বিনিয়োগ এবং অন্যান্য তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণী ৪ । ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প বিনিয়োগ (এ-টাইপ) বাস্তবায়নাধীন

দেশের নাম	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (০০০ ইউ এস ডলার)		লোক নিয়োগ	নিবন্ধন বৎসর
		প্রস্তাবিত	প্রকৃত	প্রস্তাবিত	
মালয়েশিয়া	১	১৫০০০০	০	২৮২০	১৯৯৬
যুক্তরাজ্য ও কানাডা	১	৩৮৩৮	০	৩৩	১৯৯৭
জার্মানী	১	৭০	০	২২	১৯৯৯
হংকং	১	২৬৭০	১৪১৯	৬৭০	১৯৯৬
ইতালী	১	৭২৭০	৫৪২	১৩৭	১৯৯৮
জাপান	১	৬৫০	০	১৮১	১৯৯৬
নেদারল্যান্ডস ও জার্মানী	১	২৮০০	০	৫৪৪	১৯৯৭
যুক্তরাজ্য ও হংকং	১	২০০০	০	১০৫	১৯৯৭
আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য	১	১০২১৬	০	৯২১	১৯৯৫
দ: কোরিয়া	৮	৮৮৯৮১	৩৯৯০	৮৮৯০	১৯৯৪-১৯৯৮
মোট	১৭	২৬৮৪৯৫	৫৯৫১	১৪৩২৩	

উৎস : বিইপিজেডএ, ঢাকা, ১৯৯৯ ।

সারণী ৫। যৌথ বিনিয়োগ শিল্প বিনিয়োগ (বি-টাইপ) চালুকৃত

দেশের নাম	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (০০০ ইউ এস ডলার)		প্রকৃত মোট বিনিয়োগের অংশ	লোক নিয়োগ	
		প্রস্তাবিত	প্রকৃত		প্রস্তাবিত	প্রকৃত
চীন	১	৯১০	১২৪৪ (১৩৭%)	১৩%	১১৪	১১১
ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য	১	১৪০০	৩৮৩ (২৭%)	৪%	৩০৩	৩৫৮
জার্মানী	১	৮০৪	১৮৬ (২৩%)	২%	১২১	০
হংকং	১	২১০০	১৯৬৩ (৯৩%)	২১%	৬৩২	১৩০৩
জাপান	১	৬৫০	৫৩৬ (৮২%)	৬%	৬০	৮৩
পানামা	১	৪৫৯৩	২৫৫৭ (৫৬%)	২৮%	২১৭৭	২৪৫৬
দ: কোরিয়া	১	১৭৩৬	৯৮০ (৫৬%)	১১%	২৯১	৮৩
তাইওয়ান	১	২৭৫০	১৩৯৮ (৫১%)	১৫%	৫৬০	১২৭
মোট	৮	১৪৯৪৩	৯২৪৭ (৬২%)	১০০%	৪২৫৮	৪৫২১

উৎস : বিইপিজেডএ, ঢাকা, ১৯৯৯।

১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইপিজেডে বি-টাইপ শিল্পের সংখ্যা ছিল ৮টি। এসব শিল্পে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪৯৪৩০০০ মা: ড:। কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৯২৪৭০০০ মা: ড: যা প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাত্র ৬২ ভাগ। তবে বি-টাইপ শিল্পে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতা এ-টাইপের চেয়ে ভালো। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বি-টাইপ শিল্পে প্রস্তাবের চাইতে বেশী নিয়োজিত করেছে (সারণী-৫)। বি-টাইপ বিনিয়োগ (চালুকৃত) সবচেয়ে বেশী এসেছে পানামা থেকে। পানামা মোট চালুকৃত বি-টাইপ বিনিয়োগের ২৮ ভাগ বিনিয়োগ করেছে (২৫৫৭০০০ মা: ড:)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগ এসেছে হংকং হতে। এদেশের প্রকৃত বিনিয়োগ ১৯৬৩০০০ মা: ড: যা মোট প্রকৃত বিনিয়োগের ২১ ভাগ। বি-টাইপ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়

লক্ষণীয় যে, এখানে চীন তার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রাকে ছেড়ে গেছে (লক্ষ্যমাত্রার ১৩৭ ভাগ)। অন্যান্য সকল দেশ তাদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের চেয়ে কম বিনিয়োগ করেছে। ঢাকা ইপিজেডে বাস্তবায়নাধীন বি-টাইপ শিল্প সংখ্যা ১৭টি এবং প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগ ৬৪৫৭০০০ মা: ড:। এসব শিল্প বাস্তবায়িত হলে সেখানে ৮৫৭১ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে প্রস্তাব করা আছে।

সারণী ৬। যৌথ শিল্প বিনিয়োগ (বি-টাইপ) বাস্তবায়নাধীন

দেশের নাম	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (০০০ ইউ এস ডলার)		লোক নিয়োগ (জন)	নিবন্ধন বৎসর
		প্রস্তাবিত	প্রকৃত	প্রস্তাবিত	
কানাডা	২	৫০৩৪	০	৮২১	১৯৯৪-৯৫
জার্মানী	৩	১১১৯৪	৩২৮	৮৪৬	১৯৯৫-৯৮
ভারত	১	৬১৭	০	১২৫	১৯৯৯
মালয়েশিয়া	১	১৭৭৫	০	১৩৫০	১৯৯৭
দ: কোরিয়া	৩	১৬৪০০	০	২৪৫৮	১৯৯৭-৯৮
সিঙ্গাপুর	২	২১০৬০	০	১৪৫০	১৯৯৭-৯৮
যুক্তরাজ্য	১	৪৬৩	০	৭৯	১৯৯৮
আমেরিকা	৪	৯৮৩৪	০	১৪৪২	১৯৯৪-৯৭
মোট	১৭	৬৬৪৫৭	৩২৮	৮৫৭১	৪৫২১

উৎস : বিইপিজেডএ, ঢাকা, ১৯৯৯।

সারণী-৬ এ দেখা যায় যে, বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলোর বয়স কম নয়। এখন দেখার বিষয়গুলো হলো এই বিপুল পরিমাণ প্রস্তাবিত বিনিয়োগ আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা। সারণী-৭ এ, ঢাকা ইপিজেড বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহের একটি সামগ্রিক

চিত্র ফুটিয়ে তোলা চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, চালু হবার পর হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইপিজেডে এ-টাইপ বিনিয়োগ নিবন্ধিত ঢাকা ইপিজেড চালুকৃত বি-টাইপ শিল্পে নিবন্ধিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪৯৪৩০০০ মা: ড: কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৯২৪৭০০০ মা: ড: যা প্রস্তাবের ৬৩.১ ভাগ মাত্র। এসব চালুকৃত শিল্পে ৪২৫৮ জনের কর্মসংস্থানের কথা বলা হলেও বাস্তবে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৫২১ জনের যা প্রস্তাবের ১০৬.২ ভাগ। অপরদিকে বাস্তবায়নাধীন নিবন্ধিত বি-টাইপ শিল্প বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৬৪৫৭০০০ মা: ড: কিন্তু এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ৩২৮০০০ মা: ড:। এসব বিনিয়োগ পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে আরও ৮৫৭১ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সারণী ৭। এক নজরে ঢাকা ইপিজেডে বিদেশী বিনিয়োগ

শিল্প বিনিয়োগের ধরন	বিনিয়োগ (মি. ইউ এস ডলার)		স্থানীয় কর্মসংস্থান (জন)	
ধারণ	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ	প্রকৃত বিনিয়োগ	প্রস্তাবিত	প্রকৃত
এ টাইপ (চালুকৃত)	২৪৯৩৪৭	৮৪৬৫১	৩২৪০৮	২২৯২৪
এ টাইপ (বাস্তবায়নাধীন)	২৬৮৪৫৯	৫৯৫১	১৪৩২৩	–
উপ মোট	৫১৭৮০৬	৯০৬০২	৪৬৭৩১	২২৯২৪
বি টাইপ (চালুকৃত)	১৪৯৪৩	৯২৪৭	৪২৫৮	৪৫২১
বি টাইপ (বাস্তবায়নাধীন)	৬৬৪৫৭	৩২৮	৮৫৭১	–
উপ মোট	৮১৪০০	৯৫৭৫	১২৮২৯	৪৫২১
মোট	৫৯৯২০৬	১০০১৭৭	৫৯৫৬০	২৭৪৪৫

উৎস : বিইপিজেড এ, ঢাকা, ১৯৯৯।

সারণী-৭ এ দেখা যায় ঢাকা ইপিজেডে মোট নিবন্ধকৃত বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৯৯২০৬০০০ মা: ড: এখন পর্যন্ত উৎপাদনে নিয়োজিত বিনিয়োগের

পরিমাণ ১০০১৭৭০০০ মা: ড: যা প্রস্তাবের ১৬.৭ ভাগ মাত্র। অন্যদিকে এসব বিনিয়োগের বিপরীতে প্রস্তাবিত লোক নিয়োগের সংখ্যা ৫৯৫৬০ জন হলেও এখন পর্যন্ত সুযোগ হয়েছে ২৭৪৪৫ জনের।

ঢাকা ইপিজেডে চালুকৃত এ-টাইপ শিল্পে নিয়োজিত প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৪৬৫১ মি: মা: ড:। এর মধ্যে ৭৮৮৩৪মি: মা: ড: এসেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি হতে। অন্যদিকে জাপান ও অন্যান্য উন্নত দেশ হতে এসেছে মাত্র ৫৮১৭মি: মা: ড:। অন্যদিকে বাস্তবায়নাধীন এ-টাইপ শিল্পে মোট বিনিয়োগের (২৬৮৪৫৯ মি: মা: ড:) ২.২১% অর্থাৎ ৫৯৫১ মি: মা: ড: এসেছে।

ঢাকা ইপিজেডে যখন বিদেশী বিনিয়োগের এই অবস্থা তখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদেশী বিনিয়োগ আহরণ পাশাপাশি দেশের রপ্তানিখাতকে শক্তিশালী করতে দেশের সরকারী উদ্যোগে আরও তিনটি ইপিজেড স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এসব ইপিজেডসমূহের লক্ষমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সারণী-৮ এ দ্রষ্টব্য।

সারণী ৮। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে ইপিজেডসমূহের শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা

ইপিজেড	শিল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ (মি. ইউ. এস ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)	বার্ষিক রপ্তানি (মি. ইউ. এস ডলার)
চট্টগ্রাম	১১০	৩৫০	৫০,০০০	৬০০
ঢাকা	৯০	৩০০	৪০,০০০	৫০০
কুমিল্লা	১৫০	৪০০	৬০,০০০	৭০০
মংলা	১০০	৩০০	৪০,০০০	৫০০
ঈশ্বরদী	৯০	৩০০	৪০,০০০	৭০০

সূত্র : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পৃ; ১০৮।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, শুধু ইপিজেডের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না পাশাপাশি সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ আলোর মুখ দেখে। দেশে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দরকার দেশ প্রেম এবং সচেতনতার। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিদেশী বিনিয়োগ শুধু আকর্ষণীয় অর্থনৈতিক সুবিধাদির উপর নির্ভর করে না, স্থিতিশীল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সুষ্ঠু পরিবেশ শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে কায়েম করা সম্ভব। এজন্য ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী উভয় দলকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

Chowdhury, M. D. (1982) The Export-Led Industrialisation Thesis : An Examination of Basic Issues. *The Bangladesh Journal of Political Economy, Special Issue on International Trade and Development,* Vol.,6.

Germidis, A. B. D. (1984) *Investing in Free Export Processing Zones.* OECD, Developing Countries Studies.

Government of Bangladesh (1998) Fifth Five Year Plan (1997-2002). Dhaka : Ministry of Planning.

Government of Bangladesh (1994) *Bangladesh a New Horizon for Investment.* Dhaka : Board of Investment.

Government of Bangladesh, *Bangladesh Economic Survey, various issues.* Dhaka: Ministry of Finance.

Government of Bangladesh (1999) *Bangladesh Industrial Policy-*1999. Dhaka : Ministry of Industries.

Government of Bangladesh (1998) *Guide to Investment in Bangladesh.* Dhaka : Board of Investment,

Reza, S. L, A. H. M Mahbubul Alam, Mr. ALi Rashid (1987) *Private Foreign Investment in Bangladesh.* Dhaka : The University Press Limited.

Reza, Sadrel (1991) *Transitional Corporations in Bangladesh : Still at Bay?* Dhaka : The University Press Limited.

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

বাংলাদেশের বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাঃ রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা

মোঃ আসাদুজ্জামান *
নাসরীন জাহান জিনিয়া * *

Problems of Private Registered Primary Schools in Bangladesh : A study on Pangsha Upazila of Rajbari District.

Md. Asaduzzaman / Nasrin Jahan Jinia

Abstract : Education is an instrument of human capital formation, a vehicle of social transformation. A major determinant of development and socio-economic transformation is education. Education is the mainstay of national development. Since the beginning of human civilization education has been playing an effective role in social development. Man is the principal architect of development activities of a nation and education provides maximum support to make him perfect through flourishing a balanced combination of his personality and inherent qualities (Kamrunnesa: 1992: 9). A meaningful constructive life dedicated to the welfare of mankind should be his main mission. Only education can give him a right direction in this regard. Education can also be regarded as a driving force for self-development of a human being. It helps both male and female to play an active role in the uninterrupted peace of developmental programs of the country. And primary education undoubtedly the basic foundation of a nation. As a part, Non-government Registered Primary Schools are playing very important role to educate the nation. This research article attempts to analyze and explain the problems of Non-Government Registered Primary Schools in Bangladesh..

আজ এই যান্ত্রিক যুগের আধুনিক বিশ্বে চারিদিকে শুধু ধ্বনিত হচ্ছে শিক্ষার শ্লোগান। কখনো পত্রিকায়, কখনো বেতারে, কখনো বা জাতিসংঘে। নিরক্ষর

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

* * এমফিল গবেষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মানুষের বোঝা নিয়ে জাতি আজ দিশেহারা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হয়েছে বৈজ্ঞানিক, বস্তুনির্ভর ও প্রগতিশীল। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একটি জাতি হতে পারে সুশিক্ষিত। আর এর ফলেই সামগ্রিক মূল্যবোধের জাগরণসহ দেশ ক্রমাগত হতে পারে কল্যাণমুখী। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই সর্বমানবীয় কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু ও আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম অত্যাবশ্যক।

শিক্ষা মানব জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম। শিক্ষা মানবদেহে আলোক স্বরূপ। শিক্ষা একটি প্রবহমান বিষয় যা কোন সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। মাস, বছর, যুগ পেরিয়ে শিক্ষা এগিয়ে চলে জীবনের গতিধারাকে অনুসরণ করে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এর দ্বারা একটি জাতির উন্নয়নের মান নির্ণয় করা যায়। জাতীয় উন্নয়নের মানদন্ড শিক্ষা। শিক্ষায় যে জাতি যত উন্নত সভ্যতার ইতিহাসে সে জাতির ইতিহাস তত গৌরবময়। মানুষকে সভ্য করে তুলবার একমাত্র উপায় হলো শিক্ষা। অর্থনীতির ভাষায় শিক্ষাকে বিনিয়োগ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটিয়ে মনুষত্বের বিকাশ ঘটায় শিক্ষা। সেই সঙ্গে তা মানুষের বহির্জীবনের ধারাকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকই তার সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য, সন্তানদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ঘটাবার জন্য এবং সর্বোপরি সৎ, যোগ্য, সভ্য ও আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য স্কুলে পাঠান। আর এই শিক্ষার অগ্রযাত্রায় প্রথম সোপান হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষা জীবনের সূতিকাগৃহ, সকল শিক্ষার ভিত্তি এবং এই ভিত্তির যথাযথ সংগঠনের উপর পরবর্তী শিক্ষাধাপগুলোর উন্নতি ও ধারাবাহিকতা বহুলভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের অন্যতম যার আয়তন ১,৪৮৩৯৩ বর্গ কিঃ মিঃ। প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ ৭৪০ জন লোকের বাস।

দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৪.৮২% শিক্ষিত এবং মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২৮০ মার্কিন ডলার। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমরা এখনো একটি সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম পাইনি। পাইনি কোন বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ করে একটি গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও বাস্তবে এর কোন চিত্র সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়নি। চলমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সবার জন্য অভিন্ন সুযোগ নেই। এখানে বিরাজ করছে চরম বৈষম্য এবং নৈরাজ্য। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, ঘুণেধরা। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করে একে দুরারোগ্য ক্যান্সারাক্রান্ত বলাই শ্রেয়।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একদিকে যেমন আছে পরিবর্তনের অন্যদিকে আছে অপরিবর্তনের। পরিবর্তন যা ঘটেছে তার সিংহভাগ ঘটেছে সামাজিক পরিবর্তনের হাত ধরে। কোন পূর্ব পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নয়। চেয়েছি বলে নয়। ঠেকাতে পারিনি তাই। যেমন-প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যেখানে ব্যবস্থা আছে ১০ জনের সেখানে ভিড় করছে ১০০ জন। এই বাস্তব অবস্থাকে মোকাবেলা করার জন্য এবং শিক্ষার আলো দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পাশা-পাশি বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে চলছে নোংরা রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি। সমাজ কাঠামোর উপরের স্তরের মানুষদের নোংরা রাজনীতি কিংবা স্বজনপ্রীতির কারণে হাজারো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ অস্তিত্বের লড়াইয়ে কোন রকম টিকে আছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করেছে যুগে যুগে দেশে দেশে শিক্ষা মানুষকে সত্যিকার মর্যাদা দিয়েছে, তার জীবনকে করেছে অর্থপূর্ণ। শিক্ষা মানুষের

জীবনে যে সমৃদ্ধি আনে তা বহু মাত্রিক। শিক্ষার সাহায্যেই সমাজের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানব সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার উপর সরকারের তেমন গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরো করুণ। আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা। সমস্যাগুলোর ধরন বিশ্লেষণ করাও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা প্রদান করাও এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য মূলত প্রাথমিক উৎস (Primary Source) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। Secondary source থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। Primary Source থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলত Pilot test ছাড়াই ২০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি Formal প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করার জন্য রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাকে বেছে নেয়া হয়েছে। পাংশা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম একটি উপজেলা যা আয়তনে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলা এবং জনসংখ্যায় স্বাধীন সার্কভুক্ত মালদ্বীপের জন্যসংখ্যার সাথে তুলনীয়। মূলত এ কারণেই পাংশা উপজেলাকে গবেষণা এলাকা হিসাবে বাছাই করা হয়েছে। পাংশা উপজেলার মোট ৭২টি বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে দৈবচয়নের মাধ্যমে মোট ১০টি স্কুলকে গবেষণা পরিচালনার জন্যে বাছাই করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা এলাকায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মোট ৬০জন ব্যক্তিকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকের কাছ হতে প্রশ্নপত্র পূরণের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ৬০ জনের নমুনাকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে ৮টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সমীক্ষাধীন ১০টি স্কুলের নাম এবং শ্রেণীভেদে ৬০জন মতামত প্রদানকারীর তালিকা সারণী ১-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণী ১। জরিপকৃত স্কুলসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	স্কুলের নাম	ইউনিয়নের নাম	প্রতিষ্ঠার সন	জমির পরিমাণ	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১	পার ভেল্লাবাড়ীয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ	যশাই	১৯৮৫	৩৩ শতাংশ	৪ জন	২৬৫	২২৯	৪৮৫
২	হাবাস পুর পশ্চিম পাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ	হাবাসপুর	১৯৮০	৩৩ শতাংশ	৪জন	১০৮	১১২	২২০
৩	কৃষ্ণপুর মোল্লা আফতাব উদ্দীন রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ	বাহাদুরপুর	১৯৮৪	৪৫ শতাংশ	৪জন	৫৪	৫৯	১১৩
৪	রঘুনন্দনপুর বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	হাবাসপুর	১৯৮৪	৪৫ শতাংশ	৪ জন	৮৮	৭৫	১৬৩
৫	কাঞ্চনপুর বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	যশাই	১৯৮৩	৩৩ শতাংশ	৩ জন	১৭৫	১৫১	৩২৬
৬	গঙ্গানন্দদিয়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	হাবাসপুর	১৯৭০	৩৮ শতাংশ	৪ জন	১৩৭	১১৩	২৫০
৭	কাজী মোতাহার ও আমানত আলী বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	বাহাদুরপুর	১৯৮০	৩৩ শতাংশ	৪ জন	১২৯	১১৪	২৪৩
৮	হাবাসপুর উত্তর পাড়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	হাবাসপুর	১৯৮০	৩৯ শতাংশ	৪ জন	১৭৬	১৯৬	৪৫২
৯	কবি নজরুল বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	যশাই	১৯৮৮	৩৩ শতাংশ	৪ জন	১৪২	১২০	২৬২
১০	ভট্টাচার্য্য পাড়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ	বাবু পাড়া	১৯৮৬	৩৩ শতাংশ	৪ জন	৯০	১০৩	১৯৩

সারণী ২-এ মতামত প্রদানকারীরদের তালিকা দেয়া হল। সারণী অনুসারে ৬০জন মতামত প্রদানকারী মধ্যে ১০জন সরকারী কর্মকর্তা যেমন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (৩জন) প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

সারণী ২। মতামত প্রদানকারীদের তালিকা

ক্রমিক নং	উত্তরদাতার শ্রেণী	সংখ্যা
১	উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা	১০ জন
২	সভাপতি, স্কুল ব্যভস্থাপনা কমিটি	১০ জন
৩	সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	১০ জন
৪	স্কুল শিক্ষক	০৫ জন
৫	উপজেলা পর্যায়ে রাজনীতিবিদ (Political Elite)	০৫ জন
৬	প্রভাবশালী ব্যবসায়ী (Business Elite)	০৫ জন
৭	উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	০৫ জন
৮	অভিভাবক	১০ জন
মোট		৬০ জন

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা কর্মটি রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন পরিষদের মোট ১০টি বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর পরিচালনা করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল প্রাথমিকভাবে পাংশা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই প্রযোজ্য। তারপরও বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলার বিরাজমান প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবতার সাথে প্রাপ্ত ফলাফলের (Findings) সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা যাবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা: তাত্ত্বিক কাঠামো

শিক্ষা মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এ অধিকার আদায়ের জন্য মানুষ হিসেবে সকল প্রকার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রয়োজন সঠিক যোগ্যতা। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও গুণাবলী তথা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তির, প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের যে নিরলস প্রচেষ্টা শৈশবকাল থেকে চলে তাই শিক্ষা। আক্ষরিক দিক হতে শিক্ষা কথাটির অর্থ বাড়নে সাহায্যকরণ, লালন পালন করা, প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি। ইংরেজী কবি JHÓN MILTON এর ভাষায়, "Education is a continuous process through which mental, physical, and moral training is provided for new generation who also aquire their ideas and culture through it" (আহসান, ১৯৯৭)।

অর্থনীতিবিদ Adam Smith এর ভাষায় শিক্ষা হলো "Education is one of the component of fixed capital just like machine. A man educated at the expenses of much labour and time of those employments which require extraordinary dexterity and skill may be compared to one of those expensive machine" (Smith, 1957). The World Book of Encyclopedia-তে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে-"Education is the process by which people acquire Knowledge, skills, habits, values or attitudes. The word eduation is also used to describe the results of the educational process. Education should help people become useful members of society. It should help them develop on appreciation of their cultural heritage" (The World Book of Encyclopedia, Vol. E-P-84)।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ Prof. H. H. Horne বলেন, "Education is the eternal process of superior adjustment of the physically

and mentally developed free and conscious human being to God as manifested in the intellectual, emotional and volitional environment of man" (লোকমান, ১৯৯২)। অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে শারিরীক মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত ও মুক্ত সচেতন মানব সত্ত্বাকে স্রষ্টার সঙ্গে উন্নতভাবে ও ঐচ্ছিকভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেমনটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধির দিক, আবেগগত ও ইচ্ছা সম্বন্ধীয় পরিবেশে। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলিকে স্ফূরিত, নির্গরিত ও নিয়ন্ত্রিত করে জীবনের নানা প্রয়োজনে তাকে উক্ত গুণগুলো প্রয়োগ করার শক্তি ও নৈপূণ্য দান করাই শিক্ষা। এই বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা যাতে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত হয় তার জন্য যে ব্যবস্থাদি নেওয়া হয় তা হচ্ছে শিক্ষা প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হয়। বাঞ্ছিত পথে শিশুর শারিরীক, মানসিক, নৈতিক ব্যবহারের এই প্রক্রিয়া শিক্ষা জীবনে যে পরিবর্তন আনে তা তাকে ধীরে ধীরে উন্নত জীবন যাপনে সাহায্য করে ও সমাজে স্ব-নির্ভর নাগরিক রূপে বসবাস করার যোগ্যতা দান করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" {অনুচ্ছেদ ১৭(৬), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান}।

সবার জন্য শিক্ষা (Education For All) এখন একটি বিশ্বজনীন শ্লোগান। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এটি দিবালোকের মত সত্য। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার "২০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা" নীতিমালা গ্রহণ করেছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ (বেগম, ১৯৯২)ঃ

ক) To create educational opportunity for all the children eligible for enrollments in primary schools;

খ) To ensure their continuation in the primary level and stop drop out;

গ) To improve the quality of education.

বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্যে সরকারী অনুমোদন এবং সরকারী নীতিমালার আওতায় থেকে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয় এবং এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মূল সরকারী বেতনের ৮০% ভাতা পায় তাকে বে-সরকারী রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় বলে। সরকারী বিধান অনুযায়ী বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে স্থানীয় লোকদের উদ্যোগ নিতে হয়। বাংলাদেশ রেজিঃ এ্যাক্ট ১৯৬২ এবং এতদসংক্রান্ত সংশোধনী আইন ১৯৮৯ এর ৪(১) ধারা অনুযায়ী তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ৫/১১/১৯৯৬ইং তারিখের নং প্রগবি/প্রশা-৩/৫ আর ৯/৯৩/২৪৮ স্মারকে জারিকৃত নীতিমালার ৩(ঙ) উপধারা মোতাবেক বে-সরকারী পর্যায়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালু করার জন্য অনুমতি পেতে হলে নিম্নের শর্তাদি পূরণ করতে হবেঃ

(১) বিদ্যালয়টি কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ জমির উপর হতে হবে;

(২) ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা সর্বনিম্ন ১৬০জন হতে হবে;

(৩) একজন বিজ্ঞানের শিক্ষকসহ চারজন শিক্ষক থাকতে হবে। এর মধ্যে দুইজন শিক্ষিকা থাকবে।

(৪) শিক্ষক নিয়োগের জন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে এস, এস, সি ২য় বিভাগ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ডিগ্রীপাশ হতে হবে এবং ০১/০৭/১৯৯২ থেকে আইন অনুযায়ী সরকারী স্কুলের অনুরূপ হতে হবে।

গবেষণা এলাকার বৈশিষ্ট্য

পাংশা উপজেলা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম একটি উপজেলা। পূর্বে এটি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে পাংশা রাজবাড়ী জেলার অন্তর্গত। পাংশা উপজেলা ২৩°৪৫' অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩০' দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত রাজবাড়ী জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত নদী বিধৌত এই উপজেলার সীমানা হল-উত্তরে ঐতিহ্যবাহী পাগলিনী পদ্মা নদী ও পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা, পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলা, দক্ষিণে গড়াই নদী এবং মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলা ও রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলা এবং পূর্বে রাজবাড়ী সদর উপজেলা অবস্থিত। মোট ১৭টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত পাংশা উপজেলার আয়তন ৪১৪.২৪ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি উঁচু-নিচু ও মাঝারী। বেলে, বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ, এটেল, এটেল দোআঁশ ও কিছু অঞ্চলে উর্বর দোআঁশ মাটি বিদ্যমান। উপজেলার দক্ষিণ অঞ্চল নিচু ও ঢালু। আদ্রতার পরিমাণ ৭৭% থেকে ৮৭%। উপজেলায় গড় বৃষ্টিপাত ৭৭.৭ ইঞ্চি। পাংশা উপজেলার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ তেকে ৪৮ ফুট। এ উপজেলার গড় জলবায়ু সমভাবাপন্ন। শীতকাল শুষ্ক আরামপ্রদ এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণপূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। সর্বাধিক উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয় এপ্রিল মাসে এবং সর্বাধিক শীত পরিলক্ষিত হয় জানুয়ারী মাসে।

সাহিত্য সংস্কৃতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভীড়ে পাংশায় রয়েছে একটি সমৃদ্ধ সৃজনশীল পারিপার্শ্বিকতা। কৃষ্টি ও সাহিত্য সমৃদ্ধ এ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে অবহেলিত বাঙ্গালী মুসলমানদের পুনর্জাগরণের জন্য হাতে গোনা যে কয়জন সাহিত্য সেবীর পদচারণা আমরা খুঁজে পাই তাঁদের মধ্যে সুসাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরী অন্যতম। এই ক্ষণজন্মা জ্ঞান তাপস ১৮৮৮ সালে এই উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কাজী আব্দুল ওদুদ পাংশার আর এক কৃতি সন্তান। এছাড়া আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের

আগমন ঘটেছে এই পাংশায়। তাই শিক্ষা ও সাহিত্যে পাংশা বরাবরই বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি উপজেলা। পাংশা উপজেলা একটি রাজনৈতিক সচেতন এলাকা। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে পাংশাবাসীর ভূমিকা ছিল সক্রিয়। বর্তমানে পাংশার রাজনীতি দুটি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ এবং বিএনপি । বর্তমানে দলীয় কোন্দল ও রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধ এখানের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পাংশা উপজেলার সার্বিক চিত্র পরিশিষ্ট-ক তে দেখানো হয়েছে।

মতামত প্রদানকারীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

মতামত প্রদানকারীদের আর্থ সামাজিক প্রক্ষাপট বর্ণনায় যে বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো তাদের বয়স, বৈবাহিক, অবস্থা শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশা।

ক) বয়সঃ মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১৮-৩০ বছরের মধ্যে বয়স ১১ জনের, ৩০-৪২ বছর বয়সের মধ্যে ২৪জন, ৪২-৫৪ বছরের মধ্যে ২১জন, ৫৪-৬৬ বছর বয়সের মধ্যে ৩জন এবং ৬৬ উর্দ্ধ মাত্র ১জন, অর্থাৎ মধ্যবয়সী উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

খ) বৈবাহিক অবস্থাঃ উত্তরদাতা ৬০ জনের মধ্যে ৫২জনই বিবাহিত এবং ৮জন অবিবাহিত। ৮জন অবিবাহিত উত্তর দাতার মধ্যে ৩জন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা।

গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গবেষণা কার্যক্রমে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মতামত প্রদানকারীই স্নাতক ডিগ্রীধারী। অর্থাৎ ৬০ জনের মধ্যে ২২জনই বি, এ, ডিগ্রী ধারী। ১১জন এম. এ. ডিগ্রীধারীর মধ্যে ৭জনই সরকারী কর্মকর্তা এবং উচ্চ শিক্ষিত মহিলা। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১৩ জন এস, এস, সি পাশ যার মধ্যে ৫জন অভিভাবক, ৪জন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ৩জন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি। উত্তরদাতার মধ্যে ৫জন এইচ. এস. সি পাশ এবং ৯ জনের কোন প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী নেই। এদের মধ্যে ৩জন অভিভাবক এবং ৩জন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি,

২জন সদস্য এবং ১জন স্থানীয় রাজনৈতিক এলিট।

ঘ) পেশাঃ এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনার জন্য যে ৬০ জনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে চাকুরীজীবি ৩১জন। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির ১০জন সভাপতির মধ্যে ৬জন চাকুরীজিবি, সদস্য ১০ জনের মধ্যে ৪জন চাকুরীজীবি, এবং অভিভাবক ১০ জনের মধ্যে ৪জন চাকুরীজীবি। উত্তর দাতাদের মধ্যে ১৩জন ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে ৪জন রাজনৈতিক এলিট। স্থানীয় রাজনীতিবিদগণ ব্যবসার সাথে জড়িত। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১০ জন কৃষিজীবি যাদের মধ্যে ৬জনই অভিভাবক। সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে মতামত প্রদান কারীদের প্রায় সবাই স্বচ্ছল এবং সাবলম্বী।

গবেষণার ফলাফল এবং বিশ্লেষণ

বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উপযোগিতা

অর্থনীতিবিদদের ভাষায় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। শিক্ষার এই যথাযথ গুরুত্বকে সামনে রেখে বর্তমানে বাংলাদেশে বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উপযোগিতা সম্পর্কে উত্তর দাতাদের সবাই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। অর্থাৎ ৬০জন উত্তর দাতার ৬০জনই (১০০%) বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন।

বেসরকারী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের কাঠামো পরিবর্তন

বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বর্তমানের কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতাই অর্থাৎ ৪৯ জন ইতিবাচক মতামত পোষণ করেছেন। তাদের মতে, বর্তমান কাঠামো পরিবর্তন করা না হলে যে উদ্দেশ্যে স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। অপরদিকে ১১জন নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তাদের মতে, যদি কাঠামো পরিবর্তন করতে হয় সবই সরকারী কাঠামোর আওতায় আনতেহবে যা বাস্তবে সম্ভব নয়। তবে যে গুলোর কার্যক্রম ভালো সেগুলো পর্যায়ক্রমে সরকারী কাঠামোর আওতায় আনা যেতে পারে (সারণী ৩)।

সারণী ৩। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তরদাতার সংখ্যা	হ্যাঁ	না
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	৭	৩
রাজনৈতিক এলিট	৫	৩	২
ব্যবসায়ী এলিট	৫	৫	-
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	৯	১
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	৮	২
স্কুল শিক্ষক	৫	৪	১
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	৩	২
অভিভাবক	১০	১০	-
মোট	৬০ জন	৪৯ জন	১১ জন

শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান

রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গণগত মান বেড়েছে কি না এ বিষয়ে চমৎকার ধারণা পাওয়া গেছে। গুণগত মানের ক্ষেত্রে ৬০জন উত্তর দাতার মধ্যে ৫৭ জনই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেণ (সারণী ৪)। অর্থাৎ এসব স্কুল প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার গুণগত মান বাড়ছে না। অপরদিকে, পরিমাণগত মানের ক্ষেত্রে ৬০জনই ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ সবাই এ বিষয়ে একমত যে, এ সব স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার পরিমাণগত মান বাড়ছে।

সারণী ৪ । প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তারদাতার সংখ্যা	হ্যাঁ	না
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	-	৩
রাজনৈতিক এলিট	৫	-	২
ব্যবসায়ী এলিট	৫	-	-
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	১	১
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	১	২
স্কুল শিক্ষক	৫	১	১
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	-	২
অভিভাবক	১০	-	
মোট	৬০ জন	৩ জন।	৫৭ জন।

স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার

বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমার প্রশ্নে উত্তর দাতাদের ৪২জনই ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মতে, এই সব স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যাপকভাবে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমেছে। অবশ্য ১৮জন এ বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তাদের মতে, স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমছে না। মজার ব্যাপার হলো-উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ২জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এ বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মতে, এসব স্কুল প্রতিষ্ঠার পরও স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমছে না। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মতে এ উপজেলার ঝরে পড়ার হার ৩০% (সারণী-৫)।

সারণী ৫ । স্কুলগামী ছাত্র/ছাত্রীদের ঝড়ে পড়ার হার কমছে কিনা

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তারদাতার সংখ্যা	হ্যাঁ	না
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	৭	৩
রাজনৈতিক এলিট	৫	৫	–
ব্যবসায়ী এলিট	৫	৪	১
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	৭	৩
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	৮	২
স্কুল শিক্ষক	৫	৩	২
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	২	৩
অভিভাবক	১০	৬	৪
মোট	৬০ জন	৪২ জন	১৮জন

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান

বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা করার জন্য বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে SMC বা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষমতা প্রদান প্রসঙ্গে ৬০ জনের মধ্যে ৩২জনই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন (সারণী ৬)। তাদের মতে, যেহেতু এ স্কুলসমূহ স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করা হয় এবং বেতন ভাতা সরকারী স্কেলে নয় সেহেতু এসব স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে ক্ষমতা প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। অপরদিকে ২৮জন এ বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তাদের মতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে এ সব লোকজন স্কুলের শিক্ষক হচ্ছে বিধায় শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

সারণী ৬। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদানের যৌক্তিকতা

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তারদাতার সংখ্যা	হ্যাঁ	না
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	৪	৬
রাজনৈতিক এলিট	৫	২	৩
ব্যবসায়ী এলিট	৫	৩	২
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	৯	১
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	১০	-
স্কুল শিক্ষক	৫	২	৩
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	-	৫
অভিভাবক	১০	২	৮
মোট	৬০ জন	৩২ জন	২৮ জন

SMC স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে সমস্যা

SMC গঠনে ৬০জন মতামত প্রদানকারীর প্রায় সবাই অর্থাৎ ৫১জন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন (সারণী ৭)। তাদের মতে, SMC গঠন নিয়ে এলাকায় ব্যাপকভাবে গন্ডগোল সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ব্যক্তিগত রেষারেষীকেই সবাই এর জন্যে দায়ী করেছেন। দলাদলীর কারণে একই স্কুলের একাধিক SMC গঠন হয়েছে। ফলে স্কুল পরিচালনা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মতে SMC গঠনে কঠোর সরকারী নীতিমালা থাকা অত্যাবশ্যক। মাত্র ৯জন মতামত প্রদানকারী বলেছেন SMC গঠনে কোন সমস্যা হয় না। সারণী-৭এ উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হলোঃ

সারণী ৭। SMC বা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে সমস্যা

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তরদাতার সংখ্যা	হ্যাঁ	না
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	১০	-
রাজনৈতিক এলিট	৫	৫	-
ব্যবসায়ী এলিট	৫	৫	-
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	৭	৩
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	৭	৩
স্কুল শিক্ষক	৫	৫	-
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	৫	-
অভিভাবক	১০	৭	৩
মোট	৬০ জন	৫১ জন	৯জন

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি

বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সব উত্তরদাতাই একমত যে, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। ৫০ জন উত্তরদাতাই শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কথা বলেছেন (সারণী ৮)। তাদের মতে যোগ্যতাকে মোটেও প্রাধান্য দেয়া হয়না। সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী বিত্তশালী অথবা জমিদাতার নিকটাত্মীয়রাই নিয়োগ পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। টাকা লেনদেন বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। এ কারণে সঠিক যোগ্যতা সম্পন্নদের মূল্যায়ন করা হয় না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের মতামত হলো স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি মোটা অংকের টাকা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে। আবার স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত হলো সরকারী কর্মকর্তারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে, অবৈধভাবে ক্ষমতার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক

নিয়োগের বিষয়টি সুরাহা করে থাকে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতারাও অনেকাংশে দায়ী বলে অভিভাবকরা মনে করেন। এছাড়া ৫জন শিক্ষকের মধ্যে ৪জনই টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেয়েছেন বলে মতামত জানিয়েছেন।

সারণী ৮। শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে দুর্নীতি

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তরদাতার সংখ্যা	হ্যাঁ	না
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	১০	–
রাজনৈতিক এলিট	৫	৫	–
ব্যবসায়ী এলিট	৫	৫	–
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	৭	৩
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	৭	৩
স্কুল শিক্ষক	৫	৪	১
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	৫	–
অভিভাবক	১০	৭	৩
মোট	৬০ জন	৫০ জন	১০ জন

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যোগ্যতাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ২০জন উত্তরদাতার মতে অর্থনৈতিক কারণটি শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং ১৮ জনের মতে রাজনৈতিক কারণটি দায়ী। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়টির পক্ষে মাত্র ১৩ জন মতামত প্রদান করেছেন এবং ৯জন সামাজিক যোগ্যতাকে দায়ী করেছেন

সারণী ৯। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা

উত্তরদাতার শ্রেণী	সংখ্যা	যোগ্যতা			
		সামাজিক	রাজনৈতিক	অর্থনৈতিক	শিক্ষাগত
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	১	৩	৪	২
রাজনৈতিক এলিট	৫	–	৩	২	–
ব্যবসায়ী এলিট	৫	–	২	৩	–
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	২	–	৬	২
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	২	৫	–	৩
স্কুল শিক্ষক	৫	–	–	–	৫
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	–	৩	২	–
অভিভাবক	১০	৪	২	৩	১
মোট	৬০ জন	৯ জন	১৮ জন	২০ জন	১৩ জন

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন

সরকারের গৃহীত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির ব্যাপারে ২১জন উত্তরদাতাই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তাদের মতে ব্যাপক দুর্নীতিই এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায়। ২৬জন উত্তরদাতার মতে কর্মসূচি *মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে* বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং মাত্র ১৩জনের মতে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি *সন্তোষজনকভাবে* বাস্তবায়ন হচ্ছে (সারণী ১০)।

সারণী ১০ । শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তরদাতার সংখ্যা	সন্তোষজনক	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক নয়
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	-	৮	২
রাজনৈতিক এলিট	৫	২	১	২
ব্যবসায়ী এলিট	৫	২	-	৩
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	৫	-	৫
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	৪	৬	-
স্কুল শিক্ষক	৫	-	৪	১
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	-	২	৩
অভিভাবক	১০	-	৫	৫
মোট	৬০ জন	১৩ জন	২৬ জন	২১ জন

খাদ্য বিতরণে অনিয়ম বা দুর্নীতি

গম বিতরণে দুর্নীতির প্রশ্নটি সরকারী কর্মকর্তারা কৌশলে এড়িয়ে গেলেও অধিকাংশ উত্তরদাতাই অর্থাৎ ৩৯জন অনিয়ম বা দুর্নীতির কথা বলেছেন। অনেকের মতে গম বিতরণে দুর্নীতি Open secrect. সব কিছু জেনেও সবাই নীরব। অধিকাংশ খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত স্কুলেই প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ডিলারদের সমন্বয়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় False card দেখিয়ে গম আত্মসাৎ করছে। এ বিষয়ে উপজেলার সেন গ্রাম পাড়া রেজিঃ বেসরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও [illegible] False card দেখিয়ে গম

আত্মসাৎ করছিলেন। পরবর্তীতে বিষয়টি প্রশাসনের উপর মহলে দৃষ্টি গোচর হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ২৮,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। গম বিতরণে দুর্নীতির প্রশ্নে ২১জন উত্তরদাতা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন যে, এ বিষয়ে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয় না (সারণী ১১)।

সারণী ১১। খাদ্য/গম বিতরণে অনিয়ম বা দুর্নীতি

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তারদাতার সংখ্যা	হ্যাঁ	না
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	৩	৭
রাজনৈতিক এলিট	৫	৪	১
ব্যবসায়ী এলিট	৫	৩	২
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	৭	৩
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	৬	৪
স্কুল শিক্ষক	৫	৪	১
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	৩	২
অভিভাবক	১০	৯	১
মোট	৬০ জন	৩৯ জন	২১ জন

ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

স্কুলসমূহের SMC গঠন প্রসঙ্গে অধিকাংশ অর্থাৎ ৩০ জনের মতে প্রভাব ও প্রতিপত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা অগণতান্ত্রিক। ২৭জন উত্তর দাতার মতে ভোটের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয় (সারণী ১২)।

সারণী ১২। ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তরদাতার সংখ্যা	ভোটের মাধ্যমে	প্রভাব	জানা নেই
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	৫	২	৩
রাজনৈতিক এলিট	৫	১	৪	–
ব্যবসায়ী এলিট	৫	২	৩	–
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	১০	–	–
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	৫	৫	–
স্কুল শিক্ষক	৫	১	৪	–
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	১	৪	–
অভিভাবক	১০	২	৮	–
মোট	৬০ জন	২৭ জন	৩০ জন	৩ জন

গম ডিলারদের মাধ্যমে অথবা SMCএর মাধ্যমে বিতরণ

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থাৎ সুবিধাভোগীদের মাঝে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং SMC-এর সভাপতির মাধ্যমে গম বিতরণ করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার ডিলার নিয়োগ করে সুবিধাভোগীদের মাঝে গম বিতরণ করছে। ৬০জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৮ জনই পূর্বের মাধ্যমে অর্থাৎ SMC-এর মাধ্যমে গম বিতরণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে SMC-র সভাপতি, সদস্যরা, অভিভাবকরা প্রায় সবাই একমত যে, পূর্বের মাধ্যমে গম বিতরণ যুক্তিযুক্ত ছিল। তাদের মতে, ডিলাররা সুষ্ঠুভাবে গম বিতরণ করছে না। অনেক সময় ডিলাররা গম বিক্রি করে সুবিধাভোগীদের কম হারে ...কা দেয় অথবা কম পরিমাণে গম দেয় আবার অনেক ক্ষেত্রে growth ... খাদ্য বিতরণ না করে ডিলাররা নিজেদের বাড়ী হতে গম বিতরণ ... অভিভাবকদের সমস্যা হচ্ছে। অপরপক্ষে ২২জন উত্তরদাতা গম

বিতরণে বর্তমান পদ্ধতির পক্ষে মতামত দেন। তাদের যুক্তি হলো, গম বিতরণের বিষয়টি শিক্ষকদের হাতে থাকলে অনেক সময় নষ্ট হবে এবং শিক্ষাদান কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হবে (সারণী ১৩)।

সারণী ১৩। গম বিতরণে পূর্বের না বর্তমান মাধ্যম কার্যকরী

উত্তরদাতার শ্রেণী	উত্তারদাতার সংখ্যা	পূর্বের মাধ্যম	বর্তমান মাধ্যম
উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	১০	৪	৬
রাজনৈতিক এলিট	৫	৩	২
ব্যবসায়ী এলিট	৫	১	৪
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি	১০	৯	১
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	১০	৮	২
স্কুল শিক্ষক	৫	৩	২
উচ্চ শিক্ষিত মহিলা	৫	–	৫
অভিভাবক	১০	১০	–
মোট	৬০ জন	৩৮ জন	২২ জন

সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যা

দেশের সকল শিশুর জন্য যথোপযুক্ত মানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব এত বিশাল যে, দেশের সকল নাগরিক এবং সকল সরকারী, বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা ছাড়া শুধুমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা দুঃসাধ্য। প্রাথমিক শিক্ষা হল উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি। আর এই ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তাহলে কোন জাতিই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত খুবই নড়বড়ে। আর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি চরম অবহেলিত অধ্যায়। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

(ক) কম বেতন, মর্যাদার অভাব ও অনুন্নত কর্ম পরিবেশ বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে বিরাজ করছে এক ধরনের হতাশা ও ক্ষোভ। এ সব স্কুলের শিক্ষকদের জন্যে বেতন কাঠামো বা নীতিমালা নেই। অনিয়মিতভাবে বেতন প্রাপ্তির বিষয়টিও হতাশার অন্যতম প্রধান কারণ। সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর অভাবে শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়ার কাজে মনোযোগী হতে পারে না। চাকুরীর পাশাপাশি জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়, ফলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(খ) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একতরফাভাবে SMCকে ক্ষমতা প্রদান করার ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। মোটা অংকের টাকা অনুদান গ্রহণ করে অমেধাবী, অযোগ্য লোকদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অন্যদিকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চাপের মুখে সব সময়ই অযোগ্য প্রার্থীদের এসব স্কুলে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যতো বাস্তবায়ন হচ্ছেই না বরং শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও বিরাজ করছে চরম হতাশা। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সাথে এসব স্কুলের শিক্ষকরা সরাসরি জড়িত। এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী অথবা মহিলা শিক্ষকরা স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্ত্রী, অথবা মেয়ে,ফলে এরা শিক্ষার কাজে যতটা না সময় ব্যয় করে তার চেয়ে বেশী ব্যয় করে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে।

(গ) বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের SMCকে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণের ফলে শিক্ষার পরিবেশ সামগ্রিকভাবে হুমকির মুখে। SMC গঠনের সময় এলাকার মানুষদের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি হয় যা স্কুলের সামগ্রিক অবস্থাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। অনেক বেসরকারী রেজিঃ স্কুলের একাধিক SMC রয়েছে। স্থানীয় মানুষদের দলাদলির কারণে অনেক স্কুলের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। দলাদলির কারণে SMC গঠনের যে নীতিমালা আছে তা প্রায় সময়ই মানা হয় না। এলাকার

রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের আস্থাভাজন লোকেরা এসব স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। ফলে এসব স্কুলের শিক্ষার গুণগত মান বাড়ছেনা।

(ঘ) বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের কোন পদোন্নতি নেই। পদোন্নতির ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষকরা Motivated হচ্ছে না। পড়াশুনা করানোর আগ্রহ তাঁরা হারিয়ে ফেলছেন। অনেকে এ চাকুরীটাকে Transition period মনে করে অন্য চাকুরী খোঁজতে থাকে বিধায় স্কুলে তারা খুবই অনিয়মিত হন ফলে পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়।

(ঙ) শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। অথচ বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন ঘটছেনা। এক সময় শিক্ষক এবং SMC-র সদস্যরা মিলে স্কুলের গম আত্মসাৎ করত। ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দেখিয়ে সরকারী গম বছরের পর বছর আত্মসাৎ করেছে। বর্তমানে সরকার ডিলার নিয়োগ দিয়েছে গম বিতরণের জন্য। ডিলাররা গোডাউন থেকেই গম বিক্রি করে দিয়ে শিক্ষকদের সহায়তায় অর্থ আত্মসাৎ করছে। অনেক ক্ষেত্রে গম দিলেও কম পরিমাণ গম দেয়া হয়। এরকম দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষকরা জড়িত। আর শিক্ষক সমাজ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত তখন শিক্ষা কার্যক্রমের মান কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

(চ) ভৌত অবকাঠামোর অভাব বেসরকারী স্কুলসমূহের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে চেয়ার টেবিল এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের অভাবে শিক্ষাদান পাঠে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় জায়গার সংকুলান হয় না বিধায় ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং অনেকে ঝরে পড়ছে (drop out)। অনেক স্কুল বিল্ডিং না হওয়ায় স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শিক্ষকদের বাসায় থাকে এবং প্রায়ই এসব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র হারিয়ে যায় বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন।

(ছ) বেসরকারী স্কুলসমূহের শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে আসেন না। নিজেদের সুযোগ সুবিধামত তারা স্কুলে আসেন এবং মজার ব্যাপার হলো, সপ্তাহে

কে কোন দিন আসবেন সেটা সবাই মিলে আগে থেকেই ঠিক করে নেন। এ ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারাও দায়ী। তারা উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে এসব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। পক্ষান্তরে, তাদের সাথেই কর্মকর্তাদের দহরম মহরম সম্পর্ক বিরাজ করছে। শিক্ষকদের কাজ নিয়মিত তদারকি করা, বিদ্যালয় পরিদর্শন করা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাজ কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বহীনতা, অবহেলা এবং দুর্নীতি সর্বজন স্বীকৃত। অনেক স্কুল বছরে একবারও পরিদর্শন করা হয়না। এসব স্কুলের চিত্র সাংঘাতিক পীড়াদায়ক। শুধুমাত্র কাগজে কলমে এদেঁর অস্তিত্ব আছে। গোপন লেনদেনের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালনা হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না বরং সরকারের বড় অংকের টাকার কোন Positive output আসছে না।

(জ) গবেষণা কর্মটি পরিচালনার সময় প্রায় সব শিক্ষকের কাছে থেকে একটি Common অভিযোগ পাওয়া গেছে তা হলো বর্তমানে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রমের চেয়ে দাপ্তরিক কার্যক্রম বেশী করতে হয় বিধায় স্কুলে পড়াশুনার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। গণসাক্ষরতা, টিকাদান কর্মসূচি, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, শিশু জরিপ, বয়স্ক শিক্ষা, বছরব্যাপি নানা ধরনের জরিপ ইত্যাদি কাজে শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে মূল উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না অন্যদিকে শিক্ষকরা মূল কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এক কথায় বলা যায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা বর্তমানে শিক্ষক না হয়ে সরকারের মাঠকর্মী হিসাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

(ঝ) উপজেলা পর্যায়ে সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রশাসনিক ব্যক্তিটি হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। শিক্ষা অফিসের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কমিটির সভাপতি হলেন তিনি। আমাদের দেশে প্রশাসনিক দুর্নীতি বিষয়টি Open secret জেনেও না জানার ভাণ করছে সবাই। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা অধিকাংশই স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী, বিধায় কর্তা ব্যক্তির সাথে এদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সদিচ্ছা থাকলেও দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন না। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা অফিসার এবং UNO-এর মাঝে প্রায়ই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যা সার্বিক শিক্ষার পরিবেশকে ধ্বংস করছে।

(ঞ) প্রতিটি উপজেলায় বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সমিতি রয়েছে। এই সমিতি Pressure Group হিসাবে কাজ করছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকার্যক্রম ধ্বংস হওয়ার জন্য এই সমিতি অনেকাংশেই দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। স্থানীয় পর্যায়ে সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা বেশ প্রভাবশালী। শিক্ষক এবং শিক্ষা অফিসের উপর সব সময়ই এরা স্থানীয়ভাবে প্রভাব খাটিয়ে থাকে। ফলে শিক্ষা অফিসার ঠিকমত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন না এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পারেন না।

এগুলো ছাড়াও আরো কিছু সাধারণ সমস্যা বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পড়াশুনার পরিবেশ বিঘ্নিত করছে। যেমন, শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব, প্রতিকূল পরিবেশ, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যাতায়াতের অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যা সমূহ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষিত ও সচেতন নাগকির সব সময়ই দেশের প্রত্যেকটি শিশুর জন্য আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় কামনা করছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যতগুলো কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও সর্বজনীনতার জন্য বহু মূল্যবান সুপারিশ রেখেছে। কিন্তু সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যাপক ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির পরিবর্তে ক্রমাবনতিই ঘটছে দিন দিন। এ জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করছেন। নোংরা রাজনীতির যাতাকলে প্রাথমিক শিক্ষা আজ হুমকির মুখে। দ্বী-মুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এ নিয়ে সমাজের প্রভাবশালী বা উচ্চবিত্তদের মাথা ব্যাথা নেই। সবদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং আমাদের দেশ।

সুপারিশমালা

শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সফল শিক্ষার ভিত হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার মনোন্নয়ন। প্রাথমিক শিক্ষার বৃহৎ অংশ হিসাবে বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানাবিধ সমস্যার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মনোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, শিক্ষক ও সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের সচেতনতা ও সহযোগিতা, বিশেষ করে সরকারের সুদৃষ্টি এবং সঠিক নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বত্র সমতা আনয়ন প্রয়োজন। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ

১) আকর্ষণীয় ও সমতাভিত্তিক বেতন কাঠামো তৈরী;

২) স্কুল সমূহের ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যতন্য সুযোগ সুবিধাদি বাড়ানো;

৩) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে SMC-র সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিষয়টি Redesign করে এ ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;

৪) দক্ষ, সৎ ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

৫) বাস্তবভিত্তিক, শিশুদের জীবনের সাথে সংঙ্গতিপূর্ণ পাঠ্যসূচী তৈরী করতে হবে যাতে শিশুদের আগ্রহ বাড়বে এবং নৈতিক শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে;

৬) বেসরকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির নীতিমালা তৈরী করতে হবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে;

৭) শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কঠোরভাবে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গমের পরিবর্তে টাকা দেয়া যেতে পারে যা ব্যাংকের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের প্রদান করা যেতে পারে;

৮) সরকারী কর্মকর্তাদের স্কুল পরিদর্শন নিয়মিত করতে হবে এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মকর্তাদের আরো তৎপর হতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে;

৯) শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়া অন্যান্য সব সরকারী কার্যক্রম হতে বিরত রাখতে হবে;

১০) উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকেও নিয়মিত উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করতে হবে;

১১) প্রচলিত বৈষম্যনীতি পরিহার করে সমন্বিত শিক্ষা নীতি গ্রহণ করতে হবে;

১২) স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলমুখী করে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের Home Visit করতে হবে;

১৩) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমণগত্ মান নিশ্চিত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং SMCর সভাপতি ও সদস্যদের রাজনীতিমুক্ত থাকতে হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্কুল শিক্ষক নিয়োগ এবং SMCর সদস্য নির্বাচিত করা যাবে না।

পরিশেষে, দৈনিক জনকণ্ঠের (১০.০৫.২০০০ইং তারিখের সম্পাদকীয় কলাম) ভাষায় বলতে হয়, সেই নিশি বাবুর মত শিক্ষক আজ কজন আছেন যিনি শুধু আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে পড়ানই না, ছাত্রদের জ্ঞান করতেন সন্তান তুল্য। ঝড়, বৃষ্টি-যাই হোক কখনো যার স্কুল কামাই নাই। নিশি বাবুর অংক ও ইংরেজীর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে পাঁচ গাঁয়ের লোকের মুখে শ্রদ্ধাপূর্ণ গল্প চালু আছে। নিশি বাবু শিক্ষকতাকে এমন ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন যে, চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পরও পড়ানোর কাজ শেষ হয় না। আবার যে ছেলে, যে মেয়ে খালি পায়ে, উদোম গায়ে ঘুরে বেড়ায়, পাতা কুড়ায়, শহরে ভদ্র লোকদের বাজারের মোট বয়ে দু-চার টাকা আয় করে, পরিবারের টিকে থাকার লড়াইয়ে বাপ মায়ের সঙ্গী হয়, তাকে স্কুলের পোষাক পরিয়ে তার হাতে স্কুলের বই তুলে দিয়ে, বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পালন করতে যে সরকার প্রয়োজন সেই সরকার কোথায়? সরকারের এই মৌলিক প্রয়োজন/সীমাবদ্ধতা সরকার নিজেও জানেনা। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাল মিলিয়ে বলা যেতে পারে- "দেশের লোককে শিশুকাল হতে মানুষ করবার সদুপায়ে যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্ব প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, চরিত্রে মরিব ইহা নিশ্চয়"।

পরিশিষ্ট-ক

এক নজরে পাংশা উপজেলার চিত্র

- উপজেলার আয়তন ঃ ৪১৪.২৪ বর্গ কিলোমিটার বা ১৫৯.৭৫২ বর্গ মাইল
- লোকসংখ্যা ঃ ৩,১৬,৭৫২ জন
- পুরুষ ঃ ১,৬৪,০১৪ জন
- মহিলা ঃ ১,৫২,৭৩৮জন
- লোকসংখ্যার ঘনত্ব ঃ প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৬৫জন
- শিক্ষার হার : ৪৮%
- মোট মৌজার সংখ্যা ঃ ৩৪৬টি
- মোট গ্রামের সংখ্যা ঃ ৩৫৩টি
- ইউনিয়নের সংখ্যা ঃ ১৭টি
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ ১৭টি
- পৌরসভা ঃ ১টি
- পৌরসভার আয়তন ঃ ১২.৫৪ বর্গ কিলোমিটার।
- নদী ঃ পদ্মা, গড়াই, চন্দনা
- মোট ভোটার সংখ্যা ঃ ২৫২,৩২৯ জন।
- পুরুষ ভোটার ঃ ১,৬৪,০৯৪ জন
- মহিলা ভোটার ঃ ৮৮,২৩৫জন
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ঃ বাগদী
- উপজাতীয়দের ধর্ম ঃ হিন্দু ধর্ম
- উপজাতীয়দের সংখ্যা ঃ ৫২০জন
- পরগনা ঃ নসরতশাহী
- <u>শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ</u>
- বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঃ ১টি

- ❑ মহাবিদ্যালয় ঃ ১০টি
- ❑ বালক উচ্চ বিদ্যালয় ঃ ২৭টি
- ❑ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঃ ৫টি
- ❑ নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ঃ ১৬টি
- ❑ সিনিয়র মাদ্রাসা ঃ ৯টি
- ❑ দাখিল মাদ্রাসা ঃ ১৭টি
- ❑ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৯৬টি
- ❑ বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৭২টি
- ❑ আন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ১১টি
- ❑ স্যাটালাইট বিদ্যালয় ঃ ১৩টি
- ❑ কমিউনিটি স্কুল ঃ ৬টি
- ❑ এবতেদায়ী মাদ্রাসা ঃ ৫টি
- ❑ কলেজিয়েট স্কুল ঃ ১টি
- ❑ ব্র্যাক স্কুলের সংখ্যা ঃ ৪৪টি
- ❑ গণ শিক্ষা কেন্দ্র ঃ ১টি
- ❑ দূর শিক্ষণ কেন্দ্র ঃ ১টি
- ❑ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ
- ❑ আধুনিক হেলথ কমপ্লেক্স ঃ ১টি
- ❑ প্রাইভেট ক্লিনিক ঃ ১টি
- ❑ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ৯টি
- ❑ ইউনিয়ন পরিবার কমপ্লেক্স ঃ ৮টি
- ❑ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানঃ
- ❑ শিল্পকলা একাডেমী ঃ পাংশা
- ❑ মধু সরদার ললিত কলা একাডেমী ঃ মৃগী

- কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার শাখা সংগঠন ঃ ১টি
- কেন্দ্রীয় খেলার ঘর আসর এর শাখা সংগঠন ঃ ১টি
- পত্র পত্রিকাঃ ২টি
- পদ্মাবার্তা ঃ সাপ্তাহিক পত্রিকা
- পাংশা বার্তা ঃ সাপ্তাহিক পত্রিকা
- সাহিত্য পত্রিকা ঃ ৩টি
- সাহিত্য শিখা ঃ ১টি
- মহুয়া ১টি
- পূরবী ঃ ১টি
- <u>যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ</u>
- পাকা সড়ক ঃ ১০০ কিলোমিটার
- কাঁচা সড়ক ঃ ৪৪০ কিলোমিটার
- রেল সড়ক ঃ ২৬ কিলোমিটার
- ব্রীজ ঃ ৭৫টি
- রেলষ্টেশন ঃ ৩টি
- কালভার্ট ঃ ১৭৫টি
- হাট বাজার ঃ ২৪টি
- জল মহাল ঃ ১৪টি
- ফেরীঘাট ঃ ৪টি
- বালুমহাল ঃ ১টি
- ডাকঘর ঃ ২৫টি
- সোনালী ব্যাংক ঃ ৪টি
- কৃষি ব্যাংক ঃ ৬টি
- অগ্রনী ব্যাংক ঃ ১টি

- আনছার ভিডিপি ব্যাংক ঃ ১টি
- গ্রামীণ ব্যাংক ঃ ১টি
- সিনেমা হল ঃ ৩টি
- হ্যালিপ্যাড ঃ ১টি
- আদর্শ গ্রাম ঃ ২টি
- উপজীবিকা কৃষি ঃ ৮০ ভাগ কৃষিজীবি
- ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবি ঃ ২০ ভাগ

সূত্র ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শিক্ষা অফিসার কার্য্যালয়।

- উপজেলার খাস জমি ঃ ১,৬৯১.৮৩ একর
- অর্পিত সম্পত্তি ঃ ১৩৩০৫ একর
- অনাবাদী জমি ঃ ৫০ হেক্টর
- ফসলি জমির পরিমাণ ঃ ৬,০৮,৪৫ হেক্টর
- সেচ আওতাভুক্ত এলাকা ঃ ১০,২৫০ হেক্টর
- পাওয়ার পাম্পের অধীন জমির পরিমাণ ঃ ৩৭ হেক্টর
- কৃষি ব্লকের সংখ্যা ঃ ৬৭টি
- অগভীর নলকূপ ঃ ১৮৮০টি
- গভীর নলকূপ ঃ ১০৬টি ৫৬টি চালু আছে
- শস্যের নিবিরতা ঃ ২০৩.১২%
- হস্ত চালিত/পা চালিত নলকূপ ঃ ৬৫টি
- পাওয়ার টিলার ঃ ৩২০টি
- ট্রাকটর ঃ ২টি

সুত্র ঃ উপজেলা কৃষি তথ্য অফিস।

তথ্য নির্দেশিকা

1. Begum, Kamrunnesa (1992) Universal Primary Education and Women Expectations and Constraints, in Asfia Duza and others (ed), Education and Gendre Equity: Bangladesh, Women for Women, 1-10.

2. Smith, A (1957) The Wealth of Nations London : J. M. Dont and sons Quoted by Alexander V. Alex 1983 in his book Human Capital Approach to ,Economic Development, Delhi; Metropolition.

3. The World Book of Encyclopedia, Volume-E,p-84.

৪। আহসান, সৈয়দ আলী (১৯৯৭), শিক্ষার আদর্শ। শিক্ষা সেমিনার পেপার, ঢাকা।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার (১৯৮৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৮৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত)। ঢাকা : আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।

৬। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০.০৫.২০০০ (সম্পাদকীয়), ঢাকা।

৭। লোকমান, মোহাম্মদ, (১৯৯২)। মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, পৃ-৪।

৮। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (২য় খন্ড)। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (আই, ডি, এ) প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর/শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা বাংলাদেশ, পৃ-২৯।